উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে "এ" গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই 12B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, ২০২০)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল- "কোর কোর্স", "ইলেকটিভ কোর্স", 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স' "স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স", "এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স" এবং ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF), National Credit Framework (NCrF) এবং National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি
উপাচার্য

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

চতুর্বার্ষিক স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম

(Under National Higher Education Qualificaltion Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes.)

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম (NBG)

কোর্স ঃ ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেক্টিভ কোর্স

কোর্সের শিরোনাম ঃ বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতি পরিচয়

কোর্স কোড ঃ **NEC-BG-01**

প্রথম মুদ্রণ ঃ মার্চ, 2025

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the
Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

চতুর্বার্ষিক স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম

(Under National Higher Education Qualificaltion Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes.)

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম (NBG)

কোর্স ঃ ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেক্টিভ কোর্স

কোর্সের শিরোনাম ঃ বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতি পরিচয়

কোর্স কোড ঃ NEC-BG-01

মডিউল ঃ ১, ২, ৩, ৪ Module : 1, 2, 3, 4

ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ কোর্স : Discipline Specific Elective Course : 1	লেখক Course Writer	সম্পাদনা Editor
মডিউল ঃ ১ / Module : 1 মডিউল ঃ ২ / Module : 2 মডিউল ঃ ৩ / Module : 3	অধ্যাপক আশিসকুমার দে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়	ড. নীহারকান্তি মণ্ডল অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল
মডিউল ঃ ৪ / Module : 4	ড. প্রতুলকুমার পণ্ডিত ড. নীহারকান্তি মণ্ডল	

ফরম্যাট এডিটিং

সায়নদীপ ব্যানার্জি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্তবিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক-বাংলা বিষয় সমিতি

ড. শান্তিনাথ ঝা, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, কৃষ্ণনাথ কলেজ, মুর্শিদাবাদ

ড. নীহারকান্তি মণ্ডল, সহযোগী অধ্যাপক, মুরলীধর গার্লস কলেজ, কলিকাতা

ড. চিত্রিতা ব্যানার্জি, সহযোগী অধ্যাপক, শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ, কলিকাতা

আব্দুল কাফি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ড. অনামিকা দাস, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

আমন্ত্রিত সদস্য

ড প্রাপ্তি চক্রবর্তী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সায়নদীপ ব্যানার্জি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গীতশ্রী সরকারী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণা

এই পাঠ উপকরণের সমুদায় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যাতিরেকে এই পাঠ উপকরণের কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা পুনরুৎপাদন এবং কোনো রকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ বে-আইনি ও নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় বিধিসম্মত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

অনন্যা মিত্র

নিবন্ধক (অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত)

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

(ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক)

(স্নাতক পাঠক্রম)

বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিচয়

(NEC-BG-01)

মডিউল : ১

❑ **বাংলা ও বাঙালির ভৌগোলিক নৃতাত্ত্বিক, সমাজ কাঠামো ও অর্থনৈতিক ভিত্তি** **9-36**

একক ১ বাংলা ও বাঙালি জাতির ভৌগোলিক পরিচয় 9

একক ২ বাঙালি জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় 18

একক ৩ বাংলার সমাজ কাঠামো 22

একক ৪ বাংলার অর্থনৈতিক ভিত্তি 27

মডিউল : ২

❑ **বাংলার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস ও সমন্বয় চেতনা** **37-58**

একক ৫ বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ) 37

একক ৬ বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস (আধুনিক যুগ) 44

একক ৭ বাংলার ধর্ম 49

একক ৮ বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম ও সমন্বয় চেতনা 53

মডিউল : ৩

❑ **চৈতন্যদেব ও বাংলার সংস্কৃতি ও ১৮শ শতকে বাংলার সংস্কৃতি** **61-82**

একক ৯ চৈতন্যদেব ও বাংলার সংস্কৃতি ১ 61

F:\Rajan\2025\NSOU\NEC-BG_01_Final_1st_Proof_(Date : 21_02_2025)

একক ১০ চৈতন্যদেব ও বাংলার সংস্কৃতি ২ 65

একক ১১ অষ্টাদশ শতকে বাংলার সংস্কৃতি ১ 71

একক ১২ অষ্টাদশ শতকে বাংলার সংস্কৃতি ২ 75

মডিউল : ৪

❑ **উনিশ-বিশ শতকে বাংলার সংস্কৃতি, মন্বন্তর, দেশভাগ, উদ্বাস্তু,আন্দোলন** **83-108**

একক ১৩ উনিশ ও বিশ শতকে বাংলার সংস্কৃতি ১ 85

একক ১৪ উনিশ বিশ শতকে বাংলার সংস্কৃতি ২ 89

একক ১৫ মন্বন্তর, পার্টিশন, ভূমি সংস্কার 92

একক ১৬ উদ্বাস্তু বাঙালি, নকশাল আন্দোলন, বিশ্বায়নের অভিঘাত 105

ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ঃ ১

[NEC-BG-01]

বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিচয়

মডিউল : ১

বাংলা ও বাঙালির ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক, সমাজ কাঠামো ও অর্থনৈতিক ভিত্তি

একক ১ ❑ বাংলা ও বাঙালি জাতির ভৌগোলিক পরিচয়

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ ভৌগোলিক পরিচয়

১.৪ সারাংশ

১.১ উদ্দেশ্য

প্রত্যেক জাতি নিজেদের দেশ ও পরিচয় সম্পর্কে সচেতন। বাঙালিরও নিজস্ব সত্তা ও দেশ সম্পর্কে ধারণা থাকাটা প্রয়োজন। তা না হলে বাঙালির অস্তিত্বই হারিয়ে যাবে। এই পর্যায়ে চারটি এককে বাঙালির ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যাতে বাঙালি নিজের অস্তিত্ব ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।

১.২ প্রস্তাবনা

বাংলা ও বাঙালি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হলে প্রথমেই দেশের ভৌগোলিক সীমানা এবং বঙ্গ বা বাংলা নাম সম্বন্ধে ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। বর্তমান আলোচনায় 'বঙ্গ' নামের প্রাচীনত্ব, তার ভৌগোলিক পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাচীন 'বঙ্গ' সম্পর্কে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের নির্ধারিত সীমানাই এখন পর্যন্ত সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। 'বঙ্গ' নামটির উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রি.পূর্ব দ্বিতীয় শতকে পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে'। কালিদাসের 'রঘুবংশে' রঘুর দিগ্বিজয়ে 'বঙ্গে'র উল্লেখ আছে। 'মানসোল্লাস' গ্রন্থে 'গৌড়বঙ্গাল' নামের উল্লেখ আছে। বৌধায়নের 'ধর্মসূত্রে' 'বঙ্গ' দেশের উল্লেখ আছে। মোগল আমলে 'বঙ্গ' পৃথক সুবা হিসাবে চিহ্নিত হয়। আইন-ই-আকবরীতে 'বঙ্গাল' শব্দ পাওয়া যায়। পাল বংশের রাজত্বকালে বাঙালি জাতি পৃথক জাতিরূপে স্পষ্ট হয়। [বঙ্গ শব্দের সঙ্গে 'আল' প্রত্যয় যোগ করে 'বঙ্গাল' হয়েছে] পর্তুগীজরা প্রথমে 'Bangala' শব্দটি ব্যবহার করে। অবশ্য 'বঙ্গাল' শব্দটি একাদশ/দ্বাদশ শতকের অনুশাসনেও পাওয়া যায়।

যাই হোক, বর্তমানের 'বঙ্গ' প্রাচীনকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক ভূখণ্ডে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। আলোচ্য এককে সেই প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে।

১.৩ বাংলার ভৌগোলিক পরিচয়

কোনো একটি দেশ সম্পর্কে জানতে গেলে সর্বাগ্রে সে দেশের ভৌগোলিক পরিচয় জানা দরকার। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব) গ্রন্থে বলেছেন—"একটি দেশ ও জাতির বাস্তব ইতিহাস জানিতে হইলে সর্বাগ্রে দেশের ভৌগোলিক পরিচয় লওয়া প্রয়োজন।" [দৃ. 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', (আদিপর্ব) দে'জ পাবলিশিং, ১৪২৪, পৃ. ১২১] এই ভৌগোলিক পরিচয় নেওয়ার আগে ভূগোল বা geography ব্যাপারটি নিয়ে একটু ভাবা দরকার। Pocket Oxford Dictionary (1993)-তে geography সম্পর্কে বলা হচ্ছে,—১. পৃথিবীর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, উৎসসমূহ, জলবায়ু, জনসংখ্যা ইত্যাদির বিজ্ঞান। ২. একটি এলাকার বৈশিষ্ট্য বা ব্যবস্থাপনা। আবার বাংলায় 'ভূগোল' সম্পর্কে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস বলেছেন, 'যে বিদ্যা দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত তত্ত্ব আয়ত্ত করা যায়।' ('বাঙ্গালা ভাষার অভিধান', জুলাই ১৯৮৬)। সাদামাটাভাবে আমরা বুঝি পাহাড়, নদী, মরুভূমি, দ্বীপ, সমুদ্র সব কিছু মিলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। মাঝে মাঝে সারা জগতের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের একটা গড় (average) রেখা টেনে আলোচনা করি। আবার বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে তাদের রাজনৈতিক সীমানা ও পরিচয় মনে গাঁথা হয়ে থাকে।

তাই আপাতত ভূগোলের দুটি বিভাগ করছি—প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক। আসলে যখনই বলি এক বিশেষ দেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, তখন তার রাজনৈতিক পরিচয় আড়ালে রাখা যায় না। নইলে অঞ্চলগুলির বর্ণনায় বা সীমান্তের ধারণা করব কী করে? ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যেমন একটা সর্বজাগতিকতা (transworldliness) থাকে, তেমনি আঞ্চলিকতাও থাকে (regionalism)।

বাংলা ও বাঙালির ভৌগোলিক পরিচয়ের সূচনা বলতে সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর কথা সংক্ষেপে বলব। আমরা যে ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সীমা আলোচনা করতে চাই তার তিনটে দিক—১. ভূ-প্রকৃতিগত সীমা ২. এক ধরনের জনঘনত্ব (density of population), ৩. এক ভাষা (single or homogenous language or bundle of dialects)। জাতি ও ভাষার একত্ব মধ্যযুগের আগে পূর্ণ প্রকাশিত হয় নি (one nation, one language)।

প্রথমে উত্তরের সীমার পরিচয় নেওয়া যাক। আজকের বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তে সিকিম এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা অঞ্চল; তরাই উপত্যকায় দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা। এই দুই জেলার পশ্চিম দিকে নেপাল, পূর্বে ভূটান। এছাড়া কোচবিহারেও পাহাড়ি কৌমেরা (hilly tribes) বাস করে। প্রাচীনকালে পুণ্ড্রবর্ধন ও কামরূপ রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম সীমা ছিল। বর্তমান গোয়ালপাড়া জেলার বেশির ভাগই পুণ্ড্রবর্ধনের মধ্যে পড়ত, এরকম ভাবা যায়। উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পশ্চিমদিকের শেষ সীমানা বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবে প্রভাবিত ছিল।

বাংলার পূর্ব সীমানায় উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ, মাঝে গারো, খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়; দক্ষিণে লুসাই, চট্টগ্রাম ও আরাকান। শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলার কিছু লোক বাংলা বলত এবং স্মার্ত অনুশাসন (Smarta

dictum) মেনে চলত। লৌকিক ও আর্থিক যোগাযোগ ছিল বাংলার পূর্ব প্রান্তের জেলার সঙ্গে উপযুক্ত অঞ্চলগুলির। ত্রিপুরা পর্বতমালা পাহাড়ি, চট্টগ্রামকে ত্রিপুরা থেকে আলাদা করেছে। আবার চট্টগ্রামের পাহাড় লুসাই ও ব্রহ্মদেশ (এখন মায়ানমার) থেকে পৃথক করেছে।

পশ্চিম সীমানা ক্রমশ কমে গেছে। মালদহ ও দিনাজপুর (বর্তমানে দুটি জেলা) জেলার উত্তর ও পশ্চিম সীমানাই আধুনিক বাংলার সীমানা। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এটি দ্বারভাঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আবার বর্তমান বিহারের পূর্ণিয়া আকবরী শাসনে বাংলা সুবার মধ্যে ছিল। ভূ-প্রকৃতি এবং ভাষায় বিহার ও মিথিলার সঙ্গে পুণ্ড্র-বরেন্দ্রর সামান্য পার্থক্য ছিল। য়ুয়ান-চোয়াঙ্ একেই জঙ্গল বলেছেন। রাজমহল ও সাঁওতাল পরগণার কিছু জায়গা বাংলার অন্তর্গত ছিল। ওড়িশার বালেশ্বর এবং বিহারের সিংভূম, কাঁথি সদর, ঝাড়গ্রাম মহকুমার (এখন জেলা) সঙ্গে যুক্ত ছিল। ভাষা, ভূ-প্রকৃতি, সামাজিক, সংস্কৃতি এবং কৌমবিন্যাসে (density of population) এদের ঘনিষ্ঠ দর্শক ছিল। উৎকল বর্তমান দাঁতনের (= দণ্ডভুক্তি) অন্তর্গত ছিল। রাজমহল থেকে পাহাড় এবং গেরুয়া পাহাড়িয়া ভূমি দক্ষিণে সোজা গিয়ে ময়ূরভঞ্জ-বালেশ্বর-কেওনঝর ছুঁয়ে সমুদ্র পর্যন্ত গিয়েছে। এই অঞ্চল বাংলার ভাষা, জনবিন্যাস, কৌমবিন্যাস এবং উত্তর রাঢ় ও পশ্চিম-দক্ষিণ মেদিনীপুরের ভূ-প্রকৃতি হল এর চূড়ান্ত সীমা।

বাংলার দক্ষিণের দিকে বঙ্গোপসাগর, এর তটভূমিতে মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা (বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে বিভক্ত)—খুলনা-বরিশাল-ফরিদপুর-ঢাকা দক্ষিণের শেষ প্রান্ত নোয়াখালি-চট্টগ্রামের সমতট পর্যন্ত বিস্তৃত। এগুলির বেশির ভাগই নীচু জলাজায়গা। এর সঙ্গে নদ-নদীর আনা পলিমাটি (যা খুবই উর্বর) এবং সাগরের বালি মিশ্রিত হয়ে এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি তৈরি করেছে।

এই পাঁচ প্রান্তের মধ্যেকার জমিনের মধ্যে জনপদ; ভাগীরথী-করতোয়া-ব্রহ্মপুত্র-পদ্মা-মেঘনা ও আরও অনেক নদীধৌত পাহাড়, গ্রাম, বন। একদিকে পাহাড়, দুদিকে কঠিন শিলাভূমি, আর একদিকে সাগর বা সমুদ্র মাঝখানে রয়েছে বাংলার সমভূমি অঞ্চল। এটি বাঙালির ভৌগোলিক ভাগ্য (geographical destiny) বা পরিচয়। এখনকার বাংলার উত্তরে তরাই বন, দক্ষিণে সুন্দরবন ও বিরাট জলাভূমি। ফলে বাঙালির শরীরে উষ্ণ জলীয়তার সঞ্চার হয়েছে। যার মধ্যে থাকে ক্লান্তি অবসন্নতার চিহ্ন।

বাংলার নদ-নদী ঃ

বাঙালির ইতিহাসের ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলেছে এখানকার নদ-নদী। এরা উঁচু জায়গা থেকে পলি বহন করে যেমন ব-দ্বীপের নিচু জায়গা করেছে, তেমনি গতি পরিবর্তন করে নতুন পথ বেছে নেওয়ার এবং বন্যার কারণে নগর, বন্দর, উপাসনাস্থল, গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেছে। এদের গতিপথ এবং পরিবর্তনের ধারা পুরনো ইতিহাস (প্রাচীন যুগ) আমাদের জানা নেই। কিন্তু পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক

থেকে এদের ইতিহাস নানা বিবরণে এবং মানচিত্রে জানতে পারি। এদের আগের নাম বিলুপ্ত হয়ে গেছে, এমনকি নদীটিও তার অস্তিত্ব হারিয়েছে।

এগুলির তীরে গড়ে উঠেছিল বাংলার সংস্কৃতি-অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, শিল্পের চর্চা, সাহিত্যের বৈচিত্র্য, ধর্মীয় আচার ও গোষ্ঠীর বিকাশ। যে নদী ভয়ংকরভাবে অতীতকে মুছে ফেলে, সে হয়েছে কীর্তিনাশা। অন্যেরা হল ইচ্ছামতী (= ইচ্ছামতি), ময়ূরাক্ষী, কবতাক্ষ (= কপোতাক্ষ), চূর্ণী, রূপনারায়ণ, সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, মহানন্দা কিংবা আত্রাই, মেঘনা, সুরমা। এদের নামকরণে কাব্যিকতা আছে।

এদের মধ্যে গঙ্গা ও লৌহিত্য (= ব্রহ্মপুত্র) সমুদ্রে পড়ার আগে বাংলার মাটিকে বয়ে নিয়ে গেছে। পদ্মা যেমন কীর্তিনাশা নাম পেয়েছে, তেমনি সে ও মেঘনা আজকের বাংলাদেশের প্রাণরেখা।

ষোড়শ শতক থেকে ঊনিশ শতকের শেষ অবধি বাংলার নদ-নদীগুলি অবিরত বদলেছে। এখন তাদের গতিপথ যেমন দেখছি, তা সেকালে ছিল না। নতুন নদী জন্মালেও পুরনো ভৈরব, কুমার (শিলাইদহ) এরা মরে গেছে। এদের কথা জানতে পারি মানচিত্র-নকশায়, বতুতা = ফিচ ফার্নান্দেজ বারণির লেখা ভ্রমণকথায় (travelogue) কিংবা মনসামঙ্গল, রামায়ণ, চণ্ডীমঙ্গল, গোবিন্দদাসের কড়চা বা অন্নদামঙ্গলে।

ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু ঃ লোকপ্রকৃতি

বাংলার চারটি সীমার কথা আগেই বলেছি। পশ্চিম রাঢ়ের নদ-নদীগুলি ও ভাগীরথী মুর্শিদাবাদের অনেকটা, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়ার কিছু অংশ, হুগলি-হাওড়া এবং পূর্ব মেদিনীপুরে শস্যশ্যামলা বৃক্ষবহুল জমি তৈরি করেছে।

ভূ-প্রকৃতির প্রাচীন সাক্ষ্য

কজঙ্গল : রাজা হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ভট্ট ভবদেব তার ভুবনেশ্বর শিলালিপিতে রাঢ়ের জলজঙ্গলময় প্রদেশের উল্লেখ করেছেন একাদশ শতকে। ভবিষ্য-পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে রাঢ়ী খণ্ডজঙ্গল নামে দেশের উল্লেখ আছে। বৈদ্যনাথ, বক্রেশ্বর, বীরভূম এবং অজয় নদ এই দেশে। এখানে তিন ভাগ জুড়ে জঙ্গল, এক ভাগে গ্রাম ও জনবসতি। জমিন এখানে চাষযোগ্য নয় বললেই চলে। এই অঞ্চলকে 'কজঙ্গল' নামে অভিহিত করা হত। বর্তমানের কাঁকজোল সেই নামেরই ধূসর স্মৃতি বহন করছে।

তাম্রলিপ্তি ঃ

চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান এই রাজ্যে গিয়েছিলেন। তার জমিন সমতল ও জলীয়; বাতাস গরম, ফুল ফল শস্য অঢেল। লোকের আচার-আচরণে রূঢ়তার পরিমাণ বেশি। কিন্তু এদের প্রচুর সাহস। স্থল ও জলপথ এখানে মিলেছে।

কর্ণসুবর্ণ, পুরাভূমি ও রাঙ্গামাটি ঃ

ঐ পরিব্রাজক য়ুয়ান তাম্রলিপ্তি (বর্তমানের তমলুক) থেকে কর্ণসুবর্ণে (যা ছিল এক জনবহুল রাজ্য) গিয়েছিলেন। এখানকার মানুষের অবস্থা আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল ছিল। চাষবাস ভালো। বাতাস নাতিশীতোষ্ণ। এটি এখনকার মুর্শিদাবাদের কানসোনা বলে অনুমান করা হয়।

এর রাজধানীর কাছে বিরাট বৌদ্ধবিহারের কথা তিনি বলেছেন। রাঙ্গামাটিও মুর্শিদাবাদে। এটি সমতল হলেও রাজমহল-সাঁওতালভূমির, গেরুয়া মাটি জমিনের নীচে ও ওপরে পাওয়া যায়। রক্তমৃত্তিকা বা রাঙ্গামাটি-লালমাটি (কুমিল্লা), রাঙ্গাপুর (রংপুর হতে পারে) রাঙ্গিয়া, রাঙ্গাপাড়া, রাঙ্গাগ্রাম নামের মধ্যে ব্যক্তি হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ ঃ পুরাভূমি ও নবভূমি, বরিন্দ্‌-বরেন্দ্রী ঃ

রাজমহলের উত্তরে গঙ্গা পেরিয়ে পুরাভূমির একটি রেখা। মালদহ রাজশাহী দিনাজপুর রংপুরের ভিতর দিয়ে, ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে আসামের পাহাড় ছুঁয়েছে। এখানকার মাটি পাহাড়ি গেরুয়া রংয়ের মোটা বালির। রংপুর গোয়ালপুর কামরূপে এই রেখার বিস্তার বেশি। বগুড়া-রাজশাহীর উত্তর, পূর্ব দিনাজপুর এবং রংপুরের পশ্চিমে এই রেখার উঁচু গৈরিক ভূমি দেখতে পাই। এটি হল ইসলামি ঐতিহাসিকদের বরিন্দ, আমাদের বরেন্দ্রভূমি। এর উত্তরে জলপাইগুড়ি-কোচবিহার, পূর্ণিয়ার কিছুটা। কেন্দ্রবিন্দুতে এটি ফসলহীন, পুরাভূমি। কিন্তু আত্রাই, মহানন্দা, কোশী, পদ্মা-করতোয়া তার্পণ নদী অন্যান্য দিক ঘিরে রেখেছে। এটিকে নবভূমি (Newland) বলা হয়েছে।

পুণ্ড্রবর্ধন ঃ

বরেন্দ্রভূমি পুণ্ড্রবর্ধনেরই অংশ বটে, আবার তাই পুণ্ড্রবর্ধন। সমৃদ্ধ মানুষ, জনঘনত্ব খুব, জলাশয় বিশ্রাম-কানন পুষ্পোদ্যান, জমিন সমতল, জোলো, প্রচুর শস্য, মৃদু জলবায়ু—এভাবেই চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান এর বর্ণনা করেছেন। কামরূপের লোকেরা খাটো, কালো। তারা সৎ আচরণ করলেও হিংস্র প্রকৃতির। পড়াশোনায় তারা খুব পরিশ্রম করে। তাদের ভাষা মধ্যদেশ থেকে আলাদা। এখানে যথেষ্ট হাতি দেখা যায় বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

পূর্ববঙ্গের পুরাভূমি ও নবভূমি : মধুপুরগড় ও নবভূমির দুটি ভাগ ঃ

পূর্ব বাংলা (এখনকার বাংলাদেশ) নতুনই গড়ে উঠেছে। একে গড়ে তুলেছে পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, সুরমা ও মেঘনা। ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার বড়ো অংশে গেরুয়া পাহাড়ি গজারী বনের এক টুকরো পুরাভূমির অস্তিত্ব দেখতে পাই। পার্বত্য চট্টগ্রাম, পার্বত্য ত্রিপুরা, উত্তর কাছাড় এবং দক্ষিণে হাইলাকান্দি এলাকা, শ্রীহট্ট (সিলেট) জেলাকে মোটামুটি পুরনো বা পুরাভূমি বলতে পারা যায়।

এই নতুন গড়া ভূমির দুটি ভাগ স্পষ্টত ধরা পড়ে। এর মধ্যে ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, সমতল ত্রিপুরা এবং সিলেটের গঠন পুরাকালের (Old formation)। আর খুলনা, বাখরগঞ্জ সমতল নোয়াখালি

ও সমতল চট্টগ্রামের গঠন নতুন। ষষ্ঠ-সপ্তম শতক থেমে একাদশ শতক অবধি নানান লিপি ও মূর্তি এই অঞ্চলের সমৃদ্ধি, সভ্যতা এবং জনগণের বসবাসের চিহ্ন বহন করে। আশ্চর্যের বিষয় যে, নবগঠিত সমতলে মূর্তি একেবারেই পাই না।

মধ্য বা দক্ষিণ বঙ্গের নবভূমি ঃ

এখানে পুরাভূমির (old formation) চিহ্ন নেই। এটি পদ্মা-ভাগীরথী-মধুমতীর তৈরি পলিমাটি, বন্যা একে সৃষ্টি করেছে। খাড়িমণ্ডল ব্যাঘ্রতটী সমতট নামগুলি আলোচনীয়। সমতট সমতল ত্রিপুরা অবধি ছড়ানো ছিল। কিন্তু এই অঞ্চলও তো ফরিদপুরের মতো নবভূমি। নদীয়া, যশোর, চব্বিশ পরগণা (এখন দুভাগে বিভক্ত : উত্তর ও দক্ষিণ) পুরনো গঠনের। চব্বিশ পরগণার গাঙ্গেয় অঞ্চল বহুকাল ধরে জনবসতি ও সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

সমতট ঃ

চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান একে বলেছেন, সমুদ্রতীরের দেশ। জমিন এখানে জোলো এবং সমতল। এটি তখনকার যশোর ফরিদপুর ঢাকা এলাকা বলে অনুমান করেছেন নীহাররঞ্জন রায় [বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, পৃ. ১৬৬]। নতুন ভাঙচুর সবকিছু এই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বেশি হয়েছে।

আবহাওয়া ঃ

বাংলার জলবায়ু বা আবহাওয়া খুব বেশি গরম নয়, খুব ঠাণ্ডাও নয়। কিন্তু বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান ও মেদিনীপুরে গরমের প্রভাব বেশি। পূর্ব এবং উত্তর বাংলায় মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে খুব বৃষ্টিপাত হয়। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রংপুর, পাবনা, বগুড়া, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, ফরিদপুর, বরিশাল অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য প্রসিদ্ধ।

অন্যদিকে আছে বসন্তের বাতাস। যার প্রভাবে লেখা ধোয়ীর 'পবনদূত'। এমনকি 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-এ বাতাস সম্পর্কে বেশ রোমান্টিক কিছু শ্লোক আছে। বাংলাদেশের সম্পর্কে চোল বংশের এক লিপিতে আছে যে এই দেশে বৃষ্টির কোনো বিরাম নেই।

বাঙালির জীবনে বর্ষার প্রভাব সবচেয়ে বেশি। তাই বর্ষাকে কেন্দ্র করে যত গান বা কবিতা রচিত হয়েছে, অন্য ঋতু সম্পর্কে ততটা নয়।

হেমন্ত বাঙালির জীবনে একসময় গুরুত্বপূর্ণ ঋতু ছিল। সদুক্তিকমর্ণামৃতে আছে : 'চাষীর বাড়ি শালিধানে পরিপূর্ণ হয়েছে। গ্রামের সীমান্তে যে যব হয়েছে তার শীস অরবিন্দের মতো স্নিগ্ধ শ্যাম।' পরে আধুনিক কবিতায় বিশেষ করে জীবনানন্দ দাশের লেখায় হেমন্ত পরিপূর্ণ মর্যাদায় অভিষিক্ত। একইভাবে শক্তি চট্টোপাধ্যায় কাব্য লিখেছেন 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান'। অন্যান্যদের মধ্যেও হৈমন্তী প্রভাব পড়েছে।

লোক-প্রকৃতি ঃ

য়ুয়ান-চোয়াঙ এটাও জানিয়েছিলেন যে কজঙ্গলের লোকেরা স্পষ্টভাষী, গুণবান এবং শিক্ষা সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধাশীল। আবার কামরূপের মানুষ সদাচারী হলেও চরিত্রে হিংস্রতা আছে। তাম্রলিপ্তির মানুষ কঠোর আচরণে অভ্যস্ত কিন্তু পরিশ্রমী এবং সাহসী। কর্ণসুবর্ণের মানুষ সুভদ্র এবং চরিত্রবাণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক। তাম্রলিপ্তির লোকেদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনুরাগ দেখেছেন।

এগুলি প্রাচীন সাক্ষ্য হিসেবে মূল্যবান হলেও একজন পর্যটক বিদেশির চোখে বাঙালির সব বৈশিষ্ট্য সুচারুভাবে ধরা পড়েছে, এ কথা বলা যায় না। পর্যটকের সবচেয়ে বড়ো অসুবিধা হল সীমিত লোকচরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞতা। তা হলেও আজকের দিনে আমরা তো প্রাচীন বাঙালির প্রকৃতি আঁচ করতে পারি না। তাই পর্যটকদের সাক্ষ্য সম্পূর্ণ সত্য ঘেঁষা না হলেও তাদের ছাড়া প্রাচীন বাঙালির লোকবৈশিষ্ট্য জানব কি করে? আরও কিছু পরোক্ষ সাক্ষ্য নেওয়া যেতে পারে বাঙালি চরিত্র বুঝতে :

(ক) গৌড়-পুণ্ড্র-বঙ্গের ভাষা সংস্কৃতি আচরণ সম্পর্কে আর্যদের কোনো শ্রদ্ধার ভাব ছিল না। এমনকি যোড়শ শতকে মুকুন্দ চক্রবর্তীও রাঢ়ীদের কর্কশ ও হিংস্র প্রকৃতির লোক বলেছেন। ঘনরামও লিখেছেন ‘জাতি রাঢ় আমি রে, করমে রাঢ় তু।’

দক্ষিণ রাঢ়ের ব্রাহ্মণেরা অহংকারী ছিলেন, তার প্রমাণ পাই কৃষ্ণমিত্রের ‘প্রবোধচন্দ্রোদয়’ নাটকে। এখানে নাট্যকারের শ্লেষবাক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ধোয়ী আবার এদের প্রশংসা করে বলেছেন : ‘রসময় সুহ্মদেশ’। রাজশেখরের ‘কর্পূরমপুরী’ কাব্যে নারীদের প্রশংসা করা হয়েছে একটি বিশেষ অঞ্চলের, হরিকেল (চন্দ্রদ্বীপ-শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা-ময়মনসিংহ; চট্টগ্রামও এর মধ্যে পড়তে পারে)। এরা নাকি রাঢ় ও কামরূপের নারীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ।

(খ) প্রাচীন বাংলার গাছপালা খাদ্যসম্ভার সেই দেশের পরিচয়ের উপাদান। ধান, যব, আখ, পাট, সর্ষে, আম, মহুয়া, কাঁঠাল, বস্ত্রোৎপাদন, ধাতু, খনিজ, লবণ, পান, সুপারি, নারকেল, বাঁশ, মাছ, ডুমুর, খেজুর, পিপুল, এলাচ সবকিছুই বাংলায় পাওয়া যেত। আবার বুনো প্রাণীদের মধ্যে বাঘ, হাতি, হরিণ, ঘোড়া, বানর, ভেড়া, ছাগল, মুরগী, শুয়োর, নানান মাছ উল্লিখিত হয়েছে প্রাচীন বাংলা রচনাবলীতে।

লোকালয় বিভাগ, বাংলা নামের উৎস ঃ

প্রথমে আমরা বঙ্গ বা বাংলাদেশ নামের উৎস, উল্লেখ আলোচনা করতে চাই। মোগল আমলে এটি ছিল সুবে বাংলা (প্রদেশ বাংলা)। আবুল ফজল ব্যাখ্যা করেছেন বঙ্গ শব্দের সঙ্গে আল্ যোগ করে বাংলা শব্দ এসেছে। পরে বিভিন্ন নকশায় পাই Bengala, দক্ষিণে Golfo of Bengala (= Gulf of Bengal)। মার্কো পোলো তাঁর ভ্রমণকথায় একে Bengala বললেও এর অবস্থান সুনিশ্চিত করেন নি। কিন্তু আগে যাকে ‘বঙ্গাল’ বলেছি, তা আসলে একটি অংশ বা বিভাগ। বাংলাদেশের প্রাচীন পর্বদুটি

জনপদে বিভক্ত ছিল—১. বঙ্গ, ২. অন্যটি বঙ্গাল। চর্যায় যেমন 'বঙ্গাল' পাচ্ছি। আসলে এই দুই জনপদের নামের যোগফল হল মধ্যযুগ ও এখনকার বাংলাদেশ।

বহুসময় কৌম (tribe) নামে লোকালয় চিহ্নিত হত—বঙ্গাঃ, রাঢ়াঃ, পুণ্ড্রাঃ, গৌড়াঃ। এরা যেখানে বসবাস করত, সেই বাসস্থলগুলি তাদের কৌমের নামে নির্দিষ্ট হল। একেক লোকালয়ে একেকটি রাষ্ট্র বা রাজবংশের প্রভাব ছিল। এদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হলে বা কমলে লোকালয়ের সীমাও সেরকম হত।

প্রাকৃতিক ও রাষ্ট্রসীমা কখনই এক হয় না। প্রাচীন বাংলাতেই হয় নি। অথচ আমরা যখন ঐতিহাসিক মানচিত্র বা রাষ্ট্রীয় মানচিত্র দেখি তখন প্রাকৃতিক সীমা সঠিক বোঝা যায় না। প্রাচীন জনপদ বা রাষ্ট্রশক্তির উল্লেখ উচ্চবর্ণের আর্যদের কাছ থেকেই পাই। এই জনপদগুলি ছিল স্বশাসিত এবং আলাদা। মাঝে মাঝে এদের মধ্যে সংযুক্তি এলেও স্বাতন্ত্র্য কখনই হারিয়ে যায় নি। শশাঙ্ক (সপ্তম শতক) প্রথম এদের একসূত্রে বাঁধার চেষ্টা করেন। 'গৌড়' নামকরণের ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা বেড়ে চলে। তাই পাল রাজারা বাংলা শাসন করলেও গৌড়াধিপ বা গৌড়েশ্বর নামে পরিচিত ছিলেন।

ক্রমে তিনটি জনপদ বাংলাদেশ আখ্যা পায়—পুণ্ড্র, গৌড় ও বঙ্গ। বেশ কিছু বিভাগ ও উপরিভাগও তৈরি হয়েছিল। নৈষধের হর্ষচরিত, কলহনের রাজতরঙ্গিনীতে প্রধান জনপদগুলি স্থান পেয়েছে। এই বিভাগ এবং উপবিভাগের নতুন নতুন নামকরণ হয়েছিল। প্রত্যেক রাজারই (পাল ও সেন) লক্ষ্য ছিল স্বরাট হওয়া। ঔরংজীবের সময় শায়েস্তা খাঁর শাসনে এটি হল গৌড়মণ্ডল। শশাঙ্ক বা অন্যান্যেরা জনপদকে একসূত্রে বাঁধার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা ফলপ্রসূ হয় নি। বরং ধীরে ধীরে বঙ্গ নামের অবজ্ঞাত স্থান নাম (place name) গৃহীত হল। পাঠান রাজত্বে এবং আকবরী আমলে সুবে বাংলা নামে বিখ্যাত হল। যদিও বর্তমানে বাংলা আকবরী আমলের থেকে অনেক ছোট হয়ে গেছে ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে।

১.৪ সারাংশ

আমরা অতি সংক্ষেপে বাংলা ও বাঙালির ভৌগোলিক পরিচয় দানের চেষ্টা করলাম। প্রথমে ভেবেছি ভুগোল-রাষ্ট্র-রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে কিছু জটিলতা, সমস্যা এবং তার আপত্তি সমাধান।

এ সমস্ত আলোচনায় বেশির ভাগ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব' থেকে। কারণ প্রাচীন বাংলা নিয়ে নানান বই এটির পরে বেরোলেও একটা অসামান্য ছাঁদে এখানে তথ্যের পরিবেশনা আছে। দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত নেই, বরং অনুমান মনে হয়, ধরা যায় এরকম বাক্যবন্ধে প্রাচীন ইতিহাসের বা ভূগোলের ছিন্ন তথ্যশৃঙ্খলের (broken or missing chain of information) কথা মেনে নিয়েছেন। পরবর্তী আলোচনাগুলি পরিকল্পনাহীন তা নয়। কিন্তু তার মধ্যে সবসময় বৈজ্ঞানিক সংক্ষিপ্তি, দৃষ্টিকোণ, তথ্যের ব্যবহারে নিরাসক্তি ফুটে ওঠে নি। বহু জায়গায় আবার সূত্র আড়ালে রেখে মৌলিকতার ধ্বনি আশ্রয় করা হয়েছে। কখনও আবার আমাদের

স্বভাবজ আবেগপ্রবণতা, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক পরিচয় ও তাদের পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণকে সামান্য করে তুলেছে।

আমরা মাঝে মাঝে প্রাচীন বাংলা ও বাঙালি সম্পর্কে জানাতে গিয়ে আপাত-সাম্প্রতিক কথাবার্তা ব্যবহার করেছি। কারণ কাল বদলেছে, সীমানা বদলেছে, রাষ্ট্র বদলেছে, বদলেছে রাজনীতির রাষ্ট্রীয় কাঠামো। ২০১৯-এ বসে আমরা প্রাচীনের অনুধ্যান ধ্যাননিবিষ্ট চক্ষে করতে পারি না। বরং একালীন কূটাভাস তার প্রাচীনতা, বিতর্কিত অধ্যায়গুলিকে কিভাবে পুনর্বিকশিত করেছে, তা জানা প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে।

রাজা, রাজ্য, রাজ্যের সীমানা এক থাকে নি। তাই ভৌগোলিক পরিচয়কে একটা কেলাসিত (crystallised) রূপে দেখা সম্ভব নয়। কেননা ভূগোলও পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় শাসিত।

এখানে সমস্যা এসে পড়ে অনেক। জায়গার নাম বদল হয়েছে, নদনদী আর জীবিত নেই, কোনো কোনো স্থান লুপ্ত হয়ে গেছে মাটির গর্ভে বা বালুকা বা শিলাস্তূপের নীচে, কখনও আবার একই স্থানে নতুন জনপদ হওয়ায় পুরনোটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

সারা বাংলায় বেশ কয়েকশ বছর ধরে অভিযাত্রার (migration) বিরাম নেই। গ্রাম ছেড়ে শহর, শহর থেকে অন্য শহর, শহর থেকে রাজধানী, জেলা থেকে অন্য জেলা, বাংলাদেশ থেকে অন্য প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত এই অভিযাত্রার বা অভিপ্রয়াণের রেখা। ফলে অনেক আদি পরিচয় যেমন লুপ্ত হয়েছে, তেমনি নবপরিচয়ে বাঙালি যে সন্তুষ্ট কিংবা স্থিতিলাভ করেছে, তা বলা কঠিন। ফলে বাঙালি প্রাচীনকালে নানা নামের ভেতরে যেভাবে স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছে, আজকে অনেক কারণে সেই স্থানীয় বাঙালি বিশ্বনাগরিকে (global/glocal) পরিণত হয়েছে।

যাই হোক, আমরা বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান আলোচনায় প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বঙ্গদেশের চতুঃসীমার পরিচয় সংক্ষেপে বলতে পারি—

১. উত্তরে হিমালয়, নেপাল, সিকিম ও ভুটান রাজ্য,

২. উত্তর-পশ্চিমে দ্বারবঙ্গ বা এখনকার দ্বারভাঙ্গা পর্যন্ত উত্তর সমান্তরাল ছোঁয়া সমভূমি।

৩. পূর্বে গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া (জয়ন্তিয়া/জয়ন্তী)—ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম পাহাড় থেকে দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত,

৪. পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতাল পরগণা-ছোটনাগপুর-মানভূম-কেওনঝর ও ময়ূরভঞ্জের পাহাড়ি বনভূমি ও

৫. দক্ষিণপ্রান্তে বঙ্গোপসাগর।

একক ২ ❑ বাঙালি জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

২.৪ সারাংশ

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল, শিক্ষার্থীদের বাঙালি জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। বাঙালি জাতির শরীর ও তার গঠনগত দিকের আলোচনা ও তার ঐতিহ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কৌতূহল জাগ্রত করা।

২.২ প্রস্তাবনা

বাঙালির নৃতাত্ত্বিক (Anthropological) পরিচয় জানার আগে তিনটি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া দরকার—

১. প্রাচীনতম মানুষের কঙ্কালাস্থি বা ফসিলীকৃত দেহ (Fossilised body),

২. জাতি-উপজাতি নিয়ে প্রাচীন সাহিত্য বা ঐতিহাসিক নমুনা,

৩. এখনকার জাতিগুলির নৃতত্ত্বমূলক বৈজ্ঞানিক পরিচয়।

প্রথমটি সম্পর্কে আমাদের এতাবৎ যে ধারণা ছিল, তা ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। অতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে যে নরকঙ্কাল, তা দশ হাজার লক্ষ বছর আগেকার। ফলে মানুষের আবির্ভাবকাল নিয়ে সঠিক বলা খুব কঠিন। এর পরে কোনো আবিষ্কারে হয়তো সময় আরেকটু পিছোতেও পারে। নৃতত্ত্বের ইতিহাস তাই স্থাণু হতে পারে না, তাকে পরিবর্তনশীল হতেই হবে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো।

এখানে সাহিত্য বা ইতিহাসে জাতি-উপজাতি পরিচয় যেভাবে আছে, তার বিশদ পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ তা একটি গ্রন্থের চেহারা নিতে পারে।

২.৩ বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় : নানান ধারণা ও গবেষণা

বাংলার মানুষদের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য নৃতাত্ত্বিকভাবে যদি দেখি, তা হল বিস্তৃতশিরাকতা

(Brachy cephalic)। নৃতাত্ত্বিক হাবার্ট রিজলি এদের মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতির মিশ্রণ ভেবেছিলেন। উপজাতিদের এভাবে বাংলার নৃতাত্ত্বিক পর্যায় নিরূপণে ব্যবহার করা যায় না।

হরিবংশে আছে বলি রাজার পাঁচজন ছেলের নামে পাঁচ রাজ্য তৈরি হয়েছিল। মৎস্য ও বায়ু পুরাণে আছে এরাই চাতুর্বর্ণের সৃষ্টি করেন।

বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত নিবাসী ভুটিয়া, লেপচাদের বিস্তৃত শিরাক হলেও উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা দীর্ঘশিরাক (dolicho-cephalic)। পূর্ব সীমান্তের মঙ্গোলীয়রা দীর্ঘশিরাক অথচ পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা কিন্তু বিস্তৃতশিরাক।

বাঙালির সঙ্গে মঙ্গোলীয়ের নৃতাত্ত্বিক বন্ধন যেমন মেনে নেওয়া যায় না তেমনি দ্রাবিড় জাতির কোনো রক্ত সম্বন্ধ বাঙালির সঙ্গে নেই। যদিও নিচু সম্প্রদায়ের বাঙালির মধ্যে প্রাক্-দ্রাবিড় (Preadravidiaus) রক্ত সম্পর্ক মিলিত হয়েছে।

উঁচু শ্রেণীর বাঙালি অ্যালপাইন (Alpine) শ্রেণীভুক্ত। এদের পদবীগুলি এক সময় ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এরা এক সময়ে অ্যালপাইন পর্যায়ে উপশ্রেণীর নাম ছিল। পরে বর্ণপ্রথা চালু হলে এগুলি জাতিবাচক হয়ে যায়।

বাংলার আদিম অধিবাসী ছিল প্রাক্-দ্রাবিড় শ্রেণীর। এদের আমরা আদি-অস্ত্রাল (Proto Australoid) বলতে পারি। এরা ছিল খাটো, মাথার খুলি লম্বা বা মাঝারি, নাক চওড়া ও চ্যাপ্টা, গায়ের রঙ কালো, চুল ঢেউ খেলানো। এদের প্রাচীন সাহিত্যে নিষাদ বলা হয়েছে।

আদি-অস্ত্রাল এবং ভূমধ্য-নরগোষ্ঠীর মিশ্রণে বাংলার নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি হয়েছিল। আদি অস্ত্রালদের ভাষা ছিল অস্ট্রিক। বাংলা ভাষায় অস্ট্রিক শব্দের বাহুল্য দেখে একথা মানতেই হয়।

বাংলার আদিম মানুষদের বংশধর হল উপজাতিরা (tribes)। হিন্দু সমাজ যাদের অন্ত্যজ বলেছিল, তারাও এই গোষ্ঠীর। এখন বলা হচ্ছে তফশিলিভুক্ত উপজাতি (Scheduled tribes)। অন্যান্য উপজাতিকে বলা হত অনুন্নত উপজাতি (under developed tribes)। স্বাধীনতার পর এদের তফশিলিভুক্ত উপজাতিই বলা হয়। এদের লক্ষণ হল : ১. উপজাতীয় জন্ম, ২. আদিম জীবনযাত্রা, ৩. দুর্গম স্থানে বসবাস, ৪. অনুন্নত অবস্থা।

পশ্চিমবঙ্গে এদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হল সাঁওতাল। পশ্চিমবঙ্গে ৪১টি উপজাতি আছে। যদিও সাম্প্রতিক প্রশাসনিক কারণে এদের বিভাজন আরও বেড়েছে। এরা মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূমে বসবাস করে। এদের আগে নাম ছিল 'হড়'। মেদিনীপুরের সাঁওতায় আসার পর এরা পরিচিত হয় সাঁওতাল নামে।

রাজবংশীরা যারা কোচ-উপজাতি থেকে উৎপন্ন, তারা কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও ২৪ পরগণায় থাকে। বাগদীদের সব জায়গাতে দেখতে পাই। নমঃশূদ্র ও চণ্ডাল এক নয়। বাউরীরা রাঢ় দেশের। চামাররা রবিদাসের শিষ্য মনে করলেও মুচিরা নিজেদের ঋষি বলে।

ধোপারা নেতামুনি বা ধোপানীর বংশধর। হাড়ীরা ব্রহ্মার হাতের মলিনতা থেকে জাত।

উপজাতি ও তফশিলিভুক্ত জাতিরা বাংলার আদিম মানুষ। বাকি গরিষ্ঠ অংশ অ-তফশিলি। বাংলায় যে আলপীয়রা এসেছিল তাদের সঙ্গে আদি অস্ত্রাল ও দ্রাবিড় ভাষীদের মিশ্রণ ঘটেছিল। ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সকলেই সঙ্কর জাতি বলে অতুল সুর তাঁর 'বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' (১৯৭৭) গ্রন্থে মনে করেছেন। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এর সাক্ষ্য দেয়।

বাংলায় গীতোক্ত 'চার্তুবর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্'-এর বাড়াবাড়ি ছিল না। বাংলা ছিল কৌম সমাজে গঠিত। এখানে নানা বৃত্তির (profession) লোক বাস করত। বাংলায় ছিল তন্ত্রের লীলাভূমি। বৌদ্ধরাও পরে এসে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত করেন। এদের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না।

বাংলায় সঙ্কর জাতি ছিল তিন শ্রেণীর—১. উত্তম, ২. মধ্যম, ৩. অন্ত্যজ। আরেকটি শ্রেণী ভাগ হল নবশাখ। ব্রাহ্মণেরা এদের হাতে জল গ্রহণ করতেন। এরা হল তিলি, তাঁতী, মালাকার, সদগোপ, নাপিত, বারুই, কামার, কুম্ভকার, গন্ধবণিক, ময়রা। এছাড়া করণ ও অম্বষ্ঠ ছিল। এরা পরে কায়স্থ বৈদ্য নামে পরিচিত হয়।

বাঙালি মুসলমানের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

বাঙালি মুসলমানদের তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

১. বহিরাগত

২. ধর্মান্তরিত

৩. দুজনের সংমিশ্রিত

প্রথম শ্রেণীতে পড়ে মুসলমান শাসক ও পাঠান সুলতানের আনা বিদেশি মুসলিমগণের বংশধর। স্বেচ্ছায় যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল বা যারা বলপূর্বক ধর্মান্তরিত হয়েছিল তারা দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মিশ্রণে তৃতীয় শ্রেণীর মুসলমানদের বংশধর উৎপন্ন হল। এদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

১২০৩ থেকে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা মুসলমানদের অধীনে ছিল। ১৯০১ নাগাদ একটা দাবি উঠেছিল যে তারা এ দেশের নয়, সকলেই বিদেশিদের বংশধর। ১৪১৪-৩০ খ্রিস্টাব্দে জালালুদ্দিনের শাসনে প্রাণভয়ে অনেকেই মুসলমান হয়েছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকরা কখনই বলেন নি যে উত্তর ভারত থেকে দল বেঁধে মুসলমানরা বাংলায় বসতি করেছিল। মুঘল যুগেও পূর্ব বাংলাকে স্বাস্থ্যকর জায়গা মনে করা হত না। যারা উঁচু পদে আসতেন, কিছুদিন পর দিল্লি বা আগ্রায় ফিরতেন। একমাত্র চট্টগ্রামকে আরবি মুসলমান বণিকরা বাণিজ্যের জন্য বসবাসের জায়গা হিসাবে মেনে নিয়েছিল।

হিন্দুরা স্বেচ্ছায় মুসলমানও হত। হিন্দুসমাজ যাদেরকে ছোট চোখে দেখতেন, তাদের ইসলামের

সাম্য আকর্ষণ করত। আবার 'খানকা', যেখানে আশ্রয় ও খাওয়া দাওয়া পাওয়া যেত, তারাও অনেককে ইসলাম ধর্মে টানত। পথভ্রষ্টা সধবা বা বিধবা হিন্দু সমাজে স্থান পেত না। হিন্দু রমণীরা মুসলমান উপপতির পরিবারে বিবির মর্যাদা পেত। গরীব মানুষ ছেলেমেয়ে বেচে দিত দাসত্বের হাটে। মুসলমানেরা তাদের ধর্ম বদলে দিত। হিন্দুদের বিশেষ করে উচ্চবর্ণের যবন দোষ ঘটলে (খাদ্যগ্রহণে, এমনকি ঘ্রাণেও) হিন্দুসমাজে একঘরে হয়ে তারা মুসলমান হয়ে যেতেন। মুর্শিদকুলী খানের আমলে জমিদারের খাজনা বাকি থাকলে তাকে পরিবারসহ মুসলমান করা হত।

বাঙালি মুসলমানরা যে হিন্দু থেকেই ধর্মান্তরিত, তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায়—১. হিন্দুসমাজে তাদের যে পেশা ছিল, পরে তাই করত। ২. ভাষা ও সাহিত্যে এর প্রতিফলন আছে ৩. নামকরণে আছে— ব্রজ শেখ, গোপাল মণ্ডল, ৪. অনেকে হিন্দু সংস্কার, লৌকিক আচার পরেও মেনে চলত। ৫. মহামারীর সময় শীতলা, রক্ষাকালীর পুজো করা ৬. বিয়ের পর সিঁদুর পরা (লাল নয়, অন্য রংয়ের)। এসব আচার সাম্প্রদায়িক আন্দোলন, মোল্লাদের ফতোয়া, হিন্দু সমাজের কঠোরতার জন্য অনেক পরিমাণে পালটে গেছে। বাঙালি মুসলমান আসলে এ দেশেরই মানুষ। আজকে তাই ১৯৭১-পূর্ব পাকিস্তানকে সে অন্য নাম না দিয়ে 'বাংলাদেশ' করেছে। এমনকি বাংলা সংস্কৃতির চর্চা সেখানে নিবিড়ভাবে চলছে।

২.৪ সারাংশ

আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দেখা গেল বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়। তিনটি শ্রেণীতে বাঙালিকে বিভক্ত দেখি—বাংলার আদিম অধিবাসী, ছিল প্রাক্-দ্রাবিড় (Pre-Dravidian) শ্রেণীর। এদের আবার আদি অস্ত্রালও (Proto Austroloid) বলা হয়। দ্বিতীয় হল, উচ্চশ্রেণীর বাঙালি যারা আলপাইন (Alpine) নামে চিহ্নিত। তৃতীয় হল মুসলমান সম্প্রদায়।

বাংলার আদিম মানুষদের বংশধর হল বর্তমানের উপজাতিরা (Tribe)। তাদের মধ্যে প্রধান হল সাঁওতালগণ। মুসলমানদের তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে—বহিরাগত, ধর্মান্তরিত ও সংমিশ্রিত। এই সকলকে নিয়েই বাঙালি সমাজ।

একক ৩ ❑ বাংলার সমাজ কাঠামো

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ বাংলার সমাজ কাঠামো

৩.৪ সারাংশ

৩.১ উদ্দেশ্য

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। কয়েকজন মানুষ বা ব্যক্তি মিলে একটা সমাজ গঠন করে। সেই সমাজ ব্যক্তিবর্গের কল্যাণের জন্যই নানান নিয়মকানুন বিধিনিষেধ তৈরি করে। পৃথিবীর নানা প্রান্তে নানান সমাজের দেখা পাই। বাঙালিদেরও সমাজ আছে। সেই সমাজ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। তবে সেই সমাজ পৃথিবীর গতিশীল। বাঙালি সমাজের সেই গঠন ও বিবর্তনের ধারার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটানোই এই এককের উদ্দেশ্য।

৩.২ প্রস্তাবনা

প্রথমে 'সমাজ' কথাটি স্পষ্টভাবে বোঝার দরকার আমরা অনুভব করেছি। সমাজের একক হল ব্যক্তি। ব্যক্তিদের সংহতি বা একত্রীভবন হল সমাজ। একই প্রয়োজনে কিংবা একই ফল লাভের জন্য একীভূত (unified) ভাবের নামই সমাজ। তাই প্রত্যক্ষভাবে সমাজকে দেখি না, ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দেখতে পাই। সমাজ ব্যাপারটা আসলে একটা বিমূর্ত (abstract) ধারণা বা ভাবনা। তার ক্রিয়াকলাপে (অন্যায়ের নিন্দা, সততার প্রশংসা, ব্যক্তিকে পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত করা) ঐ বিমূর্ত ভাবনাটি সাকার হয়ে ওঠে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে উৎসব বা মেলা বলতেও সমাজ শব্দ ব্যবহার করা হত। উপাসনাস্থলকে সমাজ বলা হত (যেমন ব্রাহ্মসমাজ)।

যখন আমরা সমাজ কাঠামো নিয়ে ভাবতে চাই, তখন সেখানে একটা গড়ার প্রশ্ন ওঠে। একজন নয়, অনেকে মিলে সমাজ কাঠামো তৈরি করে। কাঠামো বলতে এখানে বিভিন্ন আচার-ব্যবহার, সমষ্টির জন্য স্বার্থত্যাগ, কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ, সাংসারিক বিধি-নিষেধ যেমন বোঝানো হয়, তেমনি এই কাঠামো খুব কঠোর বা শিথিলও হতে পারে। এই সমাজ বদ্ধ (closed) বা খোলামেলা (open) এই দুই ভাগে ভাবা যেতে পারে। বদ্ধ সমাজে নিজেদের গোষ্ঠীর অনেক কিছু গোপন থাকে বাইরের মানুষের জন্য। আর খোলামেলা বা open society-তে গোপনীয়তা থাকে না।

সমাজ আবার দু'ধরনের হতে পারে : গ্রাম্য এবং নাগরিক (শহুরে)। নাগরিক সমাজ যত তাড়াতাড়ি পালটায়, গ্রাম্য সমাজ সে তুলনায় কম পরিবর্তনশীল।

৩.৩ বাংলার সমাজ কাঠামো

গ্রামীণ সমাজ বংশানুক্রমে কৌলিক বৃত্তি (family profession) পালন করত। খাদ্য উৎপন্ন না করলেও ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা তার অংশ পেতেন। শুধু খাদ্যই নয়, সারা জীবন গ্রামের মানুষের জীবন একটা নিয়মিত ছন্দে প্রবাহিত হত। একে বলতে পারি সামাজিক প্রথা (custom) এবং ঐতিহ্য (tradition)। এই দুইয়ের মধ্যে অর্থনীতি সমাজনীতি রাজনীতি বাঁধা পড়ত। ফলে কোনো পরিবর্তনের সামান্য ঢেউ সেখানেও লাগত। কিন্তু কোনো কিছু শিকড়হীন (rootless) হত না, বেপরোয়া কিছু ঘটত না।

আমাদের স্থির বিশ্বাস যে জীবন ও সমাজের ভিত্তি বা বনেদ হল অর্থনীতি। সেখানে কোনো মন্দা বা বদলের স্রোত এলে তা ধীরে ধীরে গ্রামীণ সমাজে আবর্ত ও স্থিতি (rotation and stabilisation) আনে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে সামাজিক শ্রেণীরূপ (social classification) খানিকটা স্তরবদ্ধ (ramification) ছিল। রাজা বা শাসক এবং প্রজা বা শাসিতের মধ্যে ছিল অপার ব্যবধান। রাজা ছিলেন খানিকটা রবীন্দ্রনাথের রাজার মতো জনবিচ্ছিন্ন নির্জনতার শিখরে অদৃশ্য দেবতার মতো। প্রজারা থাকত বাস্তবের রাজ্যে কঠোর পরিশ্রমের মাঝখানে। তাদের মাঝে থাকতেন জমিদার বা জায়গিরদার শ্রেণী। খাজনা বা কোনো উৎসব প্রাঙ্গণে এদের দেখা সাক্ষাৎ হত নির্লিপ্ততা ও ভক্তির পরাকাষ্ঠায়। জমিদারের কর্মচারীরা গ্রাম্য সমাজের শ্রেণীর মধ্যে পড়তেন না। হয়তো একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ছিল, কিন্তু তারা নিষ্প্রভ ছিল।

গরিব ব্রাহ্মণ তার বৃত্তির জন্য প্রতাপ দেখাতে পারতেন। বণিক, কারিগর, কৃষক সেদিক থেকে সামাজিক প্রভাবে হীন ছিল। গ্রামীণ সমাজের ভিত্তিভূমি ছিল শতকরা নব্বই জন চাষী। বাকি শতাংশের মধ্যে জমিদারী আমলা, রাজকর্মচারী, কারুশিল্পী, সম্পন্ন কৃষক (wealthy farmers), ব্রাহ্মণেরা ছিলেন। ইংরেজ আমলে এই কাঠামো খানিকটা নড়েচড়ে গেলেও মৌলিক কোনো বদল ঘটে নি। মুঘল যুগের চেয়ে ইংরেজ শাসন অনেক বেশি বিপর্যস্ত করেছিল গ্রাম্য সমাজকে। প্রাতিষ্ঠানিক ভাবনা, অর্থনৈতিক সংস্কার, সামাজিক সংস্কার এবং ধর্মনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা-ভাবনা চলে আসা গ্রামীণ সমাজকে সংকটের মুখোমুখি করেছিল।

১৭৯৩ নাগাদ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (permanent settlement) চালু হল। ১৭৬৫ থেকে ২৮ বছর ধরে এদেশি জমিদারদের সামাজিক রূপ ইংরেজদের কাছে স্পষ্ট হয়। এই স্পষ্টতা এসেছিল তাদের প্রশাসনিক স্বার্থ চরিতার্থতার মধ্য দিয়ে। জমিদাররা ক্রমেই ধনী হয়ে উঠছিলেন, ক্ষমতার দিক থেকেও।

১৭৭০ সালে মন্বন্তরে বাংলার গ্রামগুলি জনহীন হয়ে পড়েছিল। জমিদাররা সূর্যাস্ত আইনের (sunset law) কঠোরতায় অনেকে নিঃস্ব হয়ে যান। আরেক দল কলকাতায় দেওয়ানী-বেনিয়ানী-মুৎসুদ্দিগিরি করে নব্য ধনীতে পরিণত হলেন। এরা শহর ও গ্রামে প্রচুর জমি কেনেন!

জমিদাররা যখন রাজস্ব আদায়ের ঠিকাদার হলেন, তখন এক নতুন উপশ্রেণীর (subclass) সৃষ্টি হল। এরা হলেন গ্রাম্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এদের সঙ্গে শস্য উৎপাদনের সম্পর্ক রইল না। নীলচাষ বাংলার কৃষিক্ষেত্রেও সর্বনাশ ঘটাল। ফলে ১৮৬০ সালে নীলবিদ্রোহ হল।

ইতিমধ্যে কলকাতায় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা করে ইংরেজরা শিক্ষা বিস্তার করলেন। যদিও তাদের লক্ষ্য ছিল কেরানি তৈরি করা, সচেতন নাগরিক নয়। কিন্তু বিধবাবিবাহ, ব্রাহ্ম, সতীদাহ প্রথা রদ ইত্যাদির ফলে দেশে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেল। ১৮৯০ সাল নাগাদ কলকাতায় নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠল যারা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত অথচ দেশ প্রচলিত ঐতিহ্য, ধর্ম, রাজনীতিকে, সমাজকে নতুন করে যাচাই করতে চাইলেন। কিছু আগের ডিরোজিয়ান, ব্রাহ্ম, হিন্দুদের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে সমাজের পুরনোপন্থীদের সংঘর্ষ হল শারীরিক-মানসিকভাবে। সেকালের বইপত্র খবরের কাগজ এর সাক্ষ্য বহন করছে। পাইক-চুয়াড় বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নবাবদের পরিবর্তে নতুন নবাব বা হঠাৎ নবাবদের (New Naboob) দৌরাত্ম্য সব মিলে বাঙালির জীবনে অস্থিরতা দেখা দিল। এতে গ্রামজীবনও জড়িয়ে পড়ল। কেননা কলকাতার শিক্ষিত যুবকদের অনেকেই গ্রামীণ ছিলেন। তাদের নানান কাজকর্ম ও সব মিলে গ্রামের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল। এছাড়া বিদ্রোহগুলো ঘটেছিল গ্রামাঞ্চলে, শহরে নয়।

একই সময়ে বাংলার সামাজিক মননে জাতীয়তাবাদী ভাবনার সঞ্চার হল। ব্রিটিশ বা মোগল আমলের থেকে প্রাচীন হিন্দুরা ছিলেন শতগুণে ভালো—এরকম একটা চিন্তা যুবকদের একাংশকে মথিত করল। ফলে এই কালে হিন্দুধর্ম ও সভ্যতার পুনরুত্থান দেখা দিল। প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি এই মোহ থেকে সংস্কৃতি-শিল্পজগৎও বেরিয়ে আসতে পারে নি। এমনকি আশিস নন্দীর বক্তব্য হল, রবীন্দ্রনাথও এক বিরাট সময় জুড়ে পুনরুত্থান বা নব অভ্যুত্থানে সাড়া দিয়েছিলেন। আসলে শিক্ষিত রুচিবান বাঙালিরা নিজেদের একটা আত্ম-আবিষ্কারের খোঁজ করছিলেন। সামাজিক জীবনে ইংরেজি আদব কায়দা, চালচলন যেমন জায়গা করে নিচ্ছিল, তেমনি নিজেদের শিকড়ের সন্ধানে অনেকে হিন্দু সভ্যতার শরণ নিলেন। ব্রাহ্ম-ইংরেজ-হিন্দু সভ্যতার স্পর্শে শহুরে ও গ্রামীণ সামাজিকেরা শশব্যস্ত হলেন।

১৯১১ সালে কলকাতা থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারতীয় রাজধানী দিল্লিতে চলে গেল। একই সঙ্গে দুটি বিশ্বযুদ্ধ (মাঝখানে কালান্তর থাকলেও) বাঙালির জীবনকে বদলে দিল ভীষণভাবে। পুরনো সামাজিকতা, মূল্যবোধ নতুন কালের রঙে, অর্থের গরিমায় যাচাই হল। বাঙালি এর মধ্যে বিশ শতকের গোড়া থেকেই নানান প্রকারে স্বাধীনতা, স্বরাজের, অসহযোগের আন্দোলন চালিয়েছে।

স্বাধীনতার পথিকরা চরম (extremist) এবং নরম (moderate) দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন। বাঙালির সামাজিক জীবনে যে জাতিবৈর আগে দেখা দেয় নি, তা ইংরেজ দ্বারা লালিত হয়ে নতুন চেহারা নিল। বাংলার বেশ কিছু জায়গায় বাঙালির দ্রোহ নজর কাড়ল। অনেক প্রাণের বিনিময়ে রাজনৈতিক যে স্বাধীনতা আমরা পেলাম, তা খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ হয়ে থাকল। লক্ষ লক্ষ মানুষ বাংলার পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমে উত্তরে ছড়িয়ে পড়ল। উদ্বাস্তু হওয়ার যন্ত্রণা, নিজ বাসভূমে পরবাসী হওয়ার জ্বালা বাঙালি বুঝল।

ধীরে ধীরে উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের অলসতা, আত্মসন্তুষ্টির সুযোগে, আত্মীয়তার সুবাদে একটা নতুন সমাজ জীবন তৈরি করল। সে শুধু শহরে নয়, গ্রামেও ঘটল। অথচ এই দুটি অঞ্চলের ফারাক ছিল বিস্তর। প্রথমে একটা সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব দেখা গেলেও পরে তা অনেকটা মসৃণ হয়ে গেছে। পূর্ববঙ্গে হারানো বাড়ি ঘর জমি নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতো কেউ বিশেষ নেই। তারা মনে করছেন অতীত স্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে। আর পশ্চিম বাঙালিরা এই ঘরছাড়া ছিন্নমূল মানুষের উদ্যোগ-প্রয়াসে সাড়া দিয়েছে। ফলে এক নতুন সমাজ গড়ে উঠেছে বাঙালির।

গ্রাম থেকে প্রতিনিয়ত মানুষের শহুরে কিংবা বিশ্ব নাগরিক হওয়ার বাসনা বাঙালি সমাজে অভিপ্রয়াণের (migration) এক সুন্দর প্রয়াস। শিক্ষা, গবেষণা বা চাকরির জন্য গ্রামের অনেকে বিদেশে থাকছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে থাকার অভ্যাস প্রবাসী বাঙালি সমাজ গড়ে তুলছে। দুঃখের বিষয় অন্য রাজ্যে থাকার সময় তারা নানা কারণে নতুন রাজ্যের সংস্কৃতি ও ভাষাকে বরণ করছেন। বাঙালি সেখানে অন্যের ভাষা সংস্কৃতি শিখছেন বাধ্য হয়ে কিংবা সুযোগ সুবিধা পাবার আশায়। ফলে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে একটা ভাষা সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটছে। একে আমরা বাঙালি হয়ে জন্মানো মানুষের আন্তঃসাংস্কৃতিক রূপবদলই (cross-cultural transformation) বলব।

মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশবিভাগ, মহাযুদ্ধের অভিঘাত এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন সর্বোপরি রাজনৈতিক আসক্তি নিরাসক্তি কিংবা চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদ বাঙালির চেনা পরিচয়, গ্রাম-শহরের ফারাক (জীবন ও চেতনায়), অনেকটাই পালটে যাচ্ছে। বহু জনপদ যেমন অভিপ্রয়াণের সূত্রে জনহীনতায় ভুগছে, তেমনি রাজ্যের প্রশাসনিক পুনর্গঠন পরিকল্পনায় নতুন নতুন জনপদ গড়ে উঠছে। পাশাপাশি বাঙালির ব্যবসা-বাণিজ্য ষাটের দশক অবধি যেভাবে বর্ধমান ছিল, তা অভিনব মোড় নিয়েছে। বাঙালি ক্রমেই নিজের শক্তিতে আস্থা না রেখে সরকারি সাহয্যের ওপর নির্ভরতা বাড়াচ্ছে। সরকারি দাক্ষিণ্য সামাজিক মানুষের মধ্যে একটা আশা পূরণের জগৎ গড়ে তুলছে।

বাঙালি কৃষিজীবী হলেও একসময় সে চাকরিকেই পরমার্থ লাভ ভেবেছিল। এখন সমাজে সরকারি চাকরির প্রতি আগ্রহ সাংঘাতিক। শিক্ষকতায় বহু গুণ বেতন বাড়ার ফলে সেদিকেও বাঙালি সমাজ ভিড় করছে। জমিজমা আগের মতো লাভজনক নয়। তাই বাঙালি সমাজ ছোট শিল্পে, চাকরিতে বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। ফলে বাঙালি সমাজে কেরানি, ছোট পুঁজির ব্যবসায়ী বেশি বেশি করে দেখা যাচ্ছে। নগদ নারায়ণের মহিমায় তার চাষবাস অবহেলিত, যোগাযোগের উন্নতিতে দূরের জায়গা এখন অদূর

হয়েছে, শিক্ষা অনেক বাড়লেও ছাত্ররা মাধ্যমিকের আগে বা ঐ সময়ে পড়া ছেড়ে দিচ্ছে। এই অপচয়িত ছাত্রদল সমাজের সমস্যা তৈরি করছে। যদিও সরকারী প্রয়াসে এদের শিক্ষাঙ্গনে ফেরানোর প্রস্তুতি চলেছে।

৩.৪ সারাংশ

আমরা সূচনায় বলেছি সমাজ একটা ধারণা, ভাবনা (idea, thought)। এরই বহিঃপ্রকাশ মানুষের অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডে। কাজেই এই আলোচনার বহিঃপ্রকাশ (manifestation) এবং বহির্ঘটনার অভিঘাতকে এড়িয়ে তদ্গতভাবে বাঙালির সামাজিক পরিচয় দেওয়ার কোনো উপায় নেই।

কোনো সমাজই স্থবিরতায় ভোগে না, তা হলে তার মৃত্যু অনিবার্য। এভাবে পৃথিবীর বুক থেকে বহু জনসমাজ, তাদের সংস্কৃতি মুছে গেছে। ইদানীং অনেকে বলছেন বাঙালি তার সামাজিক ঐক্যবদ্ধ পরিচয় হারাচ্ছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে যারা এ নিয়ে খুব সোচ্চার, তাদের ব্যক্তিজীবনে বাঙালিয়ানা নেই। সমাজের প্রতি একটা কৃত্রিম সমবেদনা, সংস্কৃতি বা ভাষা হারানোর বেদনাও তাদের মনের গহীন থেকে উঠে আসছে এমন নয়। তবে আগে বলা কিছু উদাহরণ থেকে আমরা নিশ্চয়ই মেনে নিই যে বাঙালির সমাজ আগের মতো নেই, বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলা বাড়ছে।

বাঙালি সমাজ যে একটা অন্তঃবিস্ফোরণ (implosion) এবং বহির্বিস্ফোরণ (explosion) অনুভব করছে, একথা আমরা মানতেই পারি। যে ধর্মীয় ব্যাপারটা, আমরা সামাজিক অন্দরমহলের খোঁজে এই মুহূর্তে গুরুতর বলে ধরি নি, তার দাপট ক্রমশ বাড়ছে। বাঙালির অনেক অংশ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে উচ্চস্থানে থাকলেও ভাগ্যের পাশাখেলা তার পরম অনুসন্ধেয় বিষয়। দেব-দেবী, ধর্মে সামনাসামনি অনাস্থা দেখালেও 'ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রং' কিংবা 'নিয়তি কেন বাধ্যতে' শাস্ত্রবাক্যে আমাদের অপার অনুরাগ, ঝোঁক দেখতে পাচ্ছি। আসলে সামাজিক ও অন্যান্য সমস্যার (তার মধ্যে পারিবারিকও) মর্মস্থলে পৌঁছতে না পেরে সেই ভাগ্যচক্র বা রাশিফলের দ্বারস্থ হচ্ছি। ফলে সমাজে জ্যোতিষ, সামুদ্রিক বিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্র, কবচ তাবিজের (এখন এর রূপ বদলেছে), গ্রহশান্তি—এইসব ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এই বৃত্তের বাইরে থাকা বাঙালির সংখ্যা নগণ্য নয়। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব ধূলি পরিমাণ, নগণ্য, চোখে দেখা যায় না। বাঙালির সামাজিক কাঠামোর অদল বদলের এই সংক্ষিপ্তসার আপনাদের সমাজ সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে বলে আশা করি।

একক ৪ ❑ বাংলার অর্থনৈতিক ভিত্তি

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ বাংলার অর্থনৈতিক ভিত্তি (প্রাচীন বাংলা ও মধ্যযুগের বাংলা)

৪.৪ বাংলার অর্থনৈতিক ভিত্তি (আধুনিক বাংলা)

৪.৫ সারাংশ

৪.৬ অনুশীলনী

৪.১ উদ্দেশ্য

অর্থ ছাড়া, অর্থনীতি ছাড়া পৃথিবী অচল, বিশেষ করে বর্তমান যুগে। তবে প্রাচীনকালেও অর্থনীতির নির্ভরতা ছিল। যদিও প্রাচীন ও বর্তমান কালের অর্থব্যবস্থায় অনেক পার্থক্য। প্রাচীন বাংলার অর্থনীতি ও বর্তমান বাংলার অর্থনীতির ধারণা শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এই এককের উদ্দেশ্য।

৪.২ প্রস্তাবনা

বিখ্যাত বাগ্মী সাংসদ এডমন্ড বার্ক তাঁর 'Reflections in the Revolution in France' রচনায় লিখেছিলেন : "The age of chivalary is gone....that of Sophisters, economists and calculators, has succeeded; and the glory of Europe is extinguished for ever."-এর বাংলা অর্থ হল 'সৌজন্য-সম্ভ্রমের যুগ চলে গেছে। এখন কৌশলী প্রতারক, অর্থনীতিবিদ এবং হিসেবীরা উত্তরাধিকারী হয়েছে; য়ুরোপের গৌরববিভা নিভে গেছে চিরকালের মতো। '১৭৯০ সালে বার্ক অর্থনীতিবিদদের নিন্দাই করেছেন। অথচ আজকের যুগে অর্থনীতি ছাড়া দুনিয়া অচল, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি-সভ্যতা সবই তার ওপর নির্ভরশীল।

অর্থ এবং সেই সংক্রান্ত নীতি-নিয়মাবলীকে আমরা সমাজের ভিত্তিমূল বলতে পারি (Base-structure)। এর ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে সভ্যতার বনেদ—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপায়ণ। যখন কোনো লেখকের বই বাজারে কাটে না কিংবা শিল্পীর ছবি-ভাস্কর্য কোনো সচ্ছলতা এনে দেয় না, তখন বুঝতে পারি এরা অর্থনৈতিক ভাবে নিষ্ফল। পরে যখন ওদের বই ছবি মূর্তি লাগামছাড়া দামে বিক্রি হয় সাধারণভাবে বা নিলামে, তখন এরাই সফল বলে গণ্য হন। হয়তো জীবৎকালে অর্থের প্রাচুর্য পেলেন না। কিন্তু পরে ঐসব নিদর্শনই অর্থনৈতিক বিচারে অমূল্য বা দামি বলে গৃহীত হল।

অনেকদিন আগে ভবভূতি বলেছিলেন : ''অন্নচিন্তা চমৎকারা কবিতা কাতরে কুৎ।'' অর্থাৎ ভাতের অভাব হলে কবিতার কল্পনা কোথায় ভেসে যায়। এখানে 'অন্নচিন্তা'র বদলে 'অর্থচিন্তা' ব্যবহার করতে পারি। একটি রাষ্ট্রের মানুষদের সচ্ছলতা-সফলতা-মনীষার বিকিরণ (যেমন মহাকাশ যাত্রা) সবই অর্থের ওপর ভর দিয়ে চলে। একসময় অর্থনীতিকে গুরুত্বপূর্ণ না মনে করায় সমস্যা ধরা যেত না। বিবেকানন্দ পরিহাসের সুরে বলেছিলেন : 'টাকা থাকলেও গোল, না থাকলেও গোল।'

বাঙালির অর্থনৈতিক ভিত্তি আলোচনা করার আগে অর্থনৈতিক ভিত্তির সামান্য কথা বলা হল। এডমন্ড বার্ক হয়তো অষ্টাদশের শেষ দিকে ভদ্র সৌজন্যের বিদায় গ্রহণ এবং অর্থনীতির অভ্যুদয়কেই বুঝেছিলেন। আজকের জগতে যে রূঢ়তা অমানবিকতা ও সবকিছুকে পণ্যে পরিণত করা হয়ত তারই ফলাফল। অথচ অর্থনীতি সব কিছুর নিয়ামক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তা শুধু সৃষ্টির জগৎ নয়, ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়া রাজনীতিকেও চালনা করছে।

এখন বাংলার অর্থনৈতিক ভিত্তি যেমন স্থানীয় ব্যবসা বাণিজ্য রাজস্বের পরিমাণ, করের পরিমাণের ওপর চলছে, তেমনি আমাদের রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের অর্থনৈতিক সম্পর্ক, লেনদেন, জমা-খরচের দিকটা যথেষ্ট বিবেচনার বিষয়। ব্যক্তিগত মালিকানা সরকারি মালিকানা, সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ, বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, বাণিজ্য জগৎ, ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় সব কিছুর মূলে অর্থের ভূমিকা ধরা পড়ে। তাই বাংলার অর্থনৈতিক ভিত্তি আলোচনায় প্রাচীন মধ্য আধুনিক সাম্প্রতিককাল সংক্ষেপে বিশ্লেষিত হবে। তবে অর্থনৈতিক ভিত্তির মৌলিক উপাদান হয় কোন কোন বস্তু অর্থনীতিতে গ্রাহ্য হত (economic friend components), কারা শিল্পকর্ম ও ব্যবসায়ে কীভাবে নিযুক্ত ছিলেন, দেশি ও বিদেশি বণিকশক্তির ব্যবসা কৌশল এবং সমগ্র অর্থনৈতিক কাজকর্ম কিভাবে কোথায় ঘটত।

৪.৩ অর্থনৈতিক ভিত্তি (প্রাচীন বাংলা ও মধ্যযুগের বাংলা)

প্রাচীন বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় যে পরিকল্পনা হত, সেখানে অর্থ আসত কীভাবে? রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা শ্রম ও বুদ্ধি দিয়ে উৎপাদিত ধনের আংশিক ভোগ করতেন। ব্রাহ্মণেরাও একইভাবে সুযোগ ও অধিকারে ধন ভোগ করতেন। আসলে ধন উৎপাদনের উপায় ছিল তিনটি : কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য। দেশের উৎপাদন যেমন আর্থিক শক্তি বাড়াত, তেমনি দেশ-বিদেশে বাণিজ্যের ফলে ধনাগম হত। এর ওপরেই নির্ভর করে রাজা, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, শিক্ষা, শিল্প সংস্কৃতি সবকিছুই বিকশিত হত।

প্রথমে কৃষি নিয়ে কিছু কথা বলা যাক : কর্ষণযোগ্য ভূমির (উর্বর = ঝিলভূমি) খুব চাহিদা ছিল। খনার বচনে (যদিও ভাষায় এ কালের ছাপ পড়েছে) কোন ঋতুতে কী শস্য বোনা হবে, শস্যশালিনী জমি, কৃষিপ্রধান সমাজের ছবি পাই। চৈনিক পরিব্রাজকও বলেছেন এ দেশের শস্যভাণ্ডার উৎকৃষ্টমানের। পুন্ড্রবর্ধনের বর্ধিষ্ণু জনসমষ্টি এবং শস্য উৎপাদন তাঁর চোখে পড়েছিল। স্থল ও জলপথের কেন্দ্র তাম্রলিপ্তিতে দুষ্প্রাপ্য জিনিস মজুত করা হত। কর্ণসুবর্ণের লোকেরাও খুব ধনী ছিলেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের টীকায় বাংলার আকর দ্রব্যের কথা জানা যায়। হীরার খনির উল্লেখ পাই সেখানে। আইন-ই-আকবরীতে গড়মান্দারণে হীরকখনির কথা আছে। গৌড়িক নামে খনিজ রূপার নাম সেখানে আছে। ভবিষ্যপুরাণে লোহার খনি, তামার খনি উল্লিখিত হয়েছে। তবে এসবই খ্রিস্টপূর্ব সময়ের তবে এ যুগে ছাড়াও গাঙ্গেয় মুক্তার সন্ধান পাই।

শিল্পজাত দ্রব্য—প্রাচীন ও মধ্যযুগ

১. বস্ত্রশিল্প। দুকূল, মুগা, ক্ষৌম এসব কাপড়ের উল্লেখ পাই। এগুলি বিদেশে রপ্তানি করাও হত। মসলিনের বিদেশে কদর ছিল।

২. এখানকার মুক্তো খুব উঁচুদরের না হলেও পশ্চিম এশিয়া, মিশর, গ্রিসে, রোমে চালান যেত।

৩. ত্রিপুরার যেসব বণিক ঢাকায় যেতেন, তারা সোনার টুকরোর বদলে প্রবাল, অয়স্কান্ত মণি, সমুদ্রশঙ্খের কিংবা কচ্ছপের খোলার বালা নিয়ে যেতেন।

৪. কার্পাস উৎপাদন ও তার ব্যবসার ছিল ফলাও কারবার। কার্পাসের চাষ, গুটিপোকার চাষ এবং কাপড় শিল্পই বাংলার প্রাচীন পর্বের সবচেয়ে বড়ো শিল্প ছিল এবং এ থেকে প্রচুর ধন উৎপাদিত হত।

৫. মধ্যযুগের পট্টবস্ত্রের কথা খুব শোনা যায়। পাটের কাপড়ের শিল্পও ছিল। পাটের চাষ বহুল পরিমাণে না হলেও তা সামান্য হত, এমন বলতে পারি না।

৬. চিনি বিক্রি করে দেশে প্রচুর টাকা আসত। সিংহল, আরব, পারস্যে চিনি রপ্তানি হত।

৭. নুন ও মাছের ব্যবসা অষ্টাদশ শতক অবধি ভালই চলেছিল। মাছের একটা আন্তর্জাতিক বাজার ছিল।

কারুশিল্প : ভাস্কর্য এবং অলংকার শিল্প

সোনা, রূপা, মণি, হীরায় নানান অলংকার মথিত হয়ে ধনী মানুষ এবং দেবতার জন্য ব্যবহৃত হত। লক্ষ্মণ সেনের সোনার থালায় কিংবা রুপোর বাসনে আহার গ্রহণ সবটা গল্প নয়। একালেও বহু রাজবাড়িতে এই ধরনের সোনা রূপার থালা-পাত্রের ব্যবহার না করলেও সংগ্রহে রেখেছে।

লোহার তৈরি তরবারি (দু-মুখো), যুদ্ধাস্ত্র, কৃষিকর্মের যন্ত্রাদি কর্মকার (= কামার) শ্রেণীর লোকের প্রাচুর্যের কারণ ছিল। কুম্ভকার-বৃত্তি গ্রামে দেখা গেলেও পোড়ামাটির নানান জিনিস তৈরি হত (জলপাত্র, রন্ধনপাত্র, দোয়াত, প্রদীপ, বাটি, থালা)।

হাতির দাঁতের শিল্পও প্রচলিত ছিল। এমনকি পালকিতে যে হাতল ব্যবহার করা হত, তাতে হাতির দাঁতের ব্যবহার করত বড় মানুষেরা।

কাষ্ঠশিল্প

আসবাবপত্র, ঘরবাড়ি, মন্দির, পাল্কি, গোরুর গাড়ি, রথ, নৌকা, জাহাজ সবই কাষ্ঠশিল্পের অন্তর্গত। কাজেই কাঠমিস্ত্রিদের এক বিশেষ অর্থনৈতিক ভূমিকা ছিল।

নৌশিল্প

নদী সমুদ্রগামী নৌকা ও জাহাজ শিল্পের প্রচলনও ছিল। ফলে বন্দর গড়ে উঠেছিল। মহানাবিক বৌদ্ধগুপ্তের নাম সুখ্যাত ছিল। নৌবাণিজ্যও সবচেয়ে বেশি হত।

মুদ্রাব্যবস্থা

গণ্ডক, তাক্ষণিক মুদ্রা প্রথম খ্রিস্টাব্দে প্রচলিত থাকলেও এদের বিস্তৃত ইতিহাস জানতে পারি নি। কলিত মুদ্রার আগে সীসা, রুপো, তামার মুদ্রা ব্যবহার করা হত। গুপ্ত আমলে সোনা-রুপোর মুদ্রা দেখতে পাই। সেন আমলে সোনার মুদ্রা নেই, এমনকি রুপোর মুদ্রাও পাই না। সামুদ্রিক বাণিজ্য থেকে প্রচুর সোনা রুপোর মুদ্রা আমদানি হত। অষ্টম শতক থেকে বাঙালির বহির্বাণিজ্য প্রায় ছিল না।

মধ্যযুগের অর্থনৈতিক কাঠামো

সমাজে চাষবাস থেকে কারু-দারু ও চারুশিল্পের জন্য বিভিন্ন পেশার লোকজন ছিল। কামার, কুমোর, ছুতোর, নাপিত, তাঁতি, ধোপা, নুন তৈরিতে দক্ষ মুলুঙ্গি, পান উৎপাদক বারুই, পালকিবাহক কাহার এছাড়া চাষি, বণিক, অন্যান্য কর্মে যুক্ত শ্রমিক বাঙালির অর্থনীতি গড়ে তুলেছিল। সমাজে ধনবৈষম্য ছিল। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের বিদ্যাসুন্দর খণ্ডে নানান পেশার মানুষের কথা মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলের মতো উদ্ধার করা হয়েছে।

মুদ্রা ও বিনিময়

বাংলা চিরকালই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত। বিভিন্ন বিনিময় (barter) ব্যবস্থাও ছিল। অন্য রাজ্যের মুদ্রা ব্যবহার করা হত। কড়ির প্রচলন ছিল।

কৃষিশিল্প দ্রব্য

ধানই মুখ্য সম্পদ। পাহাড়ি জায়গায় তুলার চাষ হত। লঙ্কা, আখ, সুপারি প্রয়োজন অনুসারে উৎপন্ন হত। শিল্প দ্রব্যের মধ্যে গুড় চিনি উল্লেখ্য। পাহাড়ি সেগুন, জারুল, গর্জন কাঠের রপ্তানি চলত।

ব্যবসা-বাণিজ্য

নেপাল-তিব্বতের পণ্য আমদানি হত তমলুক, সাতগাঁ (সপ্তগ্রাম), বাংলা, হুগলি, চট্টগ্রামের বন্দরের মাধ্যম। ব্যবসা-বাণিজ্য করত ধনীলোকেরা, বাকিরা শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত ছিল। চাষি ও অন্য পেশার মানুষরা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করত। ঐ সব বন্দরে বাঙালি ছাড়াও মধ্য এশিয়া, ইরান, আরব, উত্তর ভারতের বণিকরাও থাকতেন। ষোল শতক থেকে ইউরোপীয়রা ব্যবসা-বাণিজ্যের রাশ হাতে

তুলে নিল। মুকুন্দ পণ্য বিনিময়ের তালিকা দিয়েছেন।

তখনও মধ্যবিত্ত সমাজ তৈরি হয় নি। গোমস্তা বেনেরাই ছিল মধ্যশ্রেণীর। এরা ছাড়া প্রান্তিক চাষি, খেতমজুর ছিল।

বারবোসা সোনার গাঁকে 'বাঙ্গালা শহর' বলেছেন। ফিচ্‌ ও পিরেসের বর্ণনায় এর সমর্থন মেলে।

বারবোসা বলেছেন : বড় বড় বণিকেরা জাহাজের মালিক ছিলেন। অনেক মালপত্র বড়ো বড়ো জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হত। চোলমন্ডল, মালাস্কা, সুমাত্রা, পেরু, কাম্বোদিয়া, সিংহল প্রভৃতি দেশে এখানকার পণ্যদ্রব্য যেত।

পিরেস যেমন বলেছেন বাঙালিরা খুব বণিক জাতের, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি স্বাধীন প্রকৃতির। সব বাঙালি বেনেই সাধুতার ধার ধারতেন না।

সোনার গাঁয়ে চট্টগ্রাম হয়েই যেতে হত। কেননা গঙ্গার মোহনা চট্টগ্রামের কাছেই ছিল। বিপ্রদাস, বিজয় গুপ্ত, মুকুন্দ চক্রবর্তী বাংলার বহিঃ এবং আন্তঃবাণিজ্যের যে বিবরণ দিয়েছেন, সেখানে অত্যুক্তি ছিল না। চন্দন, মুসাব্বর (ঘৃতকুমারী), চাল আবিসিনিয়া, গ্রীস, আরব, ইরান, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও চীনে রপ্তানি হত। পর্যটকদের বর্ণনায় এর পক্ষে সাক্ষ্য পাই।

বারবোসা এখানে উৎপাদিত দ্রব্যের নাম করেছেন : তুলো, আখ, আদা, লঙ্কা, কমলালেবু, লেবু, শুকনো ফল (dry fruits)। শিল্প তালিকায় আছে মিহি ও রঙিন কাপড়, সারব্যস্ত, মামোলা, দাগায়জা (= ওড়না), চৌতার (= সুতির জামার কাপড়), বিতিলহা ইত্যাদি কাপড়, বিচিত্র সুতি কাপড় প্রভৃতি।

চতুর্দশ শতকে কড়িই ছিল বিনিময়ের মাধ্যম (medium of exchange)। এক টাকা মানে ১৫২০ কড়ি। তাল ও খেজুরের রস থেকে মদ তৈরি হত। গাছের ছাল দিয়ে কাগজ তৈরি করত (= ভূর্জপত্র বা প্যাপিরাসের মতো)।

৪.৪ বাংলার অর্থনৈতিক ভিত্তি (আধুনিক বাংলা)

আধুনিক যুগের অর্থনৈতিক কাঠামো

প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে বাঙালির অর্থনৈতিক কাঠামো বা ভিত্তি অনেক পালটেছে। এ যুগে যেমন চাষবাসের ধান আছে, তেমনি পাট একটা শিল্প হিসাবে গড়ে উঠেছিল। একেবারে হাল আমলে পাটের সেই বাজার বা রমরমা নেই। উৎপাদিত দ্রব্য প্রায় একই থাকলেও বস্ত্রশিল্পে বাঙালির প্রাচীন গৌরব আর নেই, সুতির জায়গায় নতুন কাপড় আসছে অন্যান্য প্রদেশ থেকে। ফলে বাংলার বস্ত্র বা পাটশিল্প তার মহিমা হারিয়েছে।

এখনও বাংলার রফতানি হল ফলমূল, ফুল, প্রতিমাশিল্প, পাথর বা কাঠের কাজ, বিভিন্ন ধরনের কুটিরশিল্প, বালুচরী, কাঁথা-শাড়ি, মিষ্টান্ন ইত্যাদি। আগে যেমন ভারতের শেফিল্ড বলে খ্যাত বাঙালির বিভিন্ন ধাতুদ্রব্য এখন তার সেদিন নেই। প্রাচীন যুগ থেকে চিনির যে কারবার বাঙালি চালিয়েছে, তা

এখন অস্তিত্বহীন। চিনিকলের পাশাপাশি ধানকল (রাইস মিল) আগের মতো দাপুটে ব্যবসা করে না। তবু বাংলার চাল, কয়লা ইত্যাদি কিছু ব্যবসা এখন অনেকটা কেন্দ্রীয় অধীনে গেলেও সুখ্যাতি বজায় রেখেছে।

বাংলার রাজস্ব, বৃত্তিগত আয়, ব্যবসাগত আয়ের অনেকটাই চলে যায় যুক্ত তালিকায় (concurrent list)। এর থেকে যেমন স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে বা অন্যান্য খাতে কিছু টাকা বাংলা পায় কিন্তু তার পরিমাণ যৎসামান্য। যানবাহন, পৌরনিগম, পৌরসংস্থা, পঞ্চায়েত ইত্যাদি থেকে বাংলা সরকারের কিছু আয় হয়। তবে কেন্দ্রীয় দাক্ষিণ্যে সব রাজ্য সরকারের অর্থাভাব লক্ষ করি। বাংলা তার ব্যতিক্রম নয়।

শিল্পক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়লেও কর্মসংস্থান যেমন বাড়ছে না। বাঙালি এখন ব্যবসার চেয়ে চাকরিতে বেশি মন দিয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় সংস্থা, রাজ্য সংস্থা—সব জায়গাতে বাঙালি নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করেছে। শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও। ছোট ও মাঝারি ব্যবসা ছাড়া বাঙালির বাণিজ্য সাধনায় আর কিছু নেই। ব্যবসায় লাভালাভ অনিশ্চিত বলেই হয়তো চাকরির নির্দিষ্ট মাইনেতে অনেকে নিযুক্ত হয়েছেন। তবু বিজ্ঞান ও অন্যান্য গবেষণার সুবাদে, পেটেন্ট আবিষ্কার করে বহু বাঙালি বিজ্ঞানী ব্যবসায়িক সাফল্য দেখতে পাচ্ছেন।

৪.৫ সারাংশ

অষ্টম শতকের পর যেমন বাঙালির সমুদ্র বাণিজ্য হারিয়ে গেছে, তেমনি মধ্যযুগীয়, উনিশ শতকী-বিশ শতকী বাঙালির অর্থনৈতিক কাঠামোসমূহ বদলেছে। স্বাধীন ব্যবসার স্বপ্ন সে আর দেখে না। বরং বাঁধা মাইনের দাসত্বে সে তৃপ্ত। তা বলে ব্যবসা নানাভাবে চলছে। বাঙালি এখন যানবাহনের ব্যবসায়ে পারদর্শী। অটো, টোটো, ওলা, উবের ইত্যাদি নানা ধরনের গাড়ির যন্ত্রাংশবিদ্যা ও চালনায় সে ভালোই কৃতিত্ব দেখাচ্ছে। মাঝারি ব্যবসা বলতে নতুন একটা দিক বাঙালি জীবনে এসেছে। তা হল ইমারতি দ্রব্যের ব্যবসা এবং বাড়ি তৈরির ব্যবসা, জমির ব্যবসা বাঙালির একটা বড়ো অংশ করছে। আসলে যেসব জায়গা-জমি নিয়ে কোনদিন কারুর মাথাব্যথা ছিল না, সেগুলি মহার্ঘ্য এবং লাভজনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সমাজে প্রোমোটার, ডেভলাপার শ্রেণী গড়ে উঠেছে।

এই সময় এরা অর্থনীতির নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ আবাসন তৈরির সঙ্গে সহায়ক শিল্প রূপে অনেক কিছু জড়িয়ে থাকে। আবার পঞ্চায়েত কিংবা স্বশাসন ব্যবস্থা (local self-govt. or development board)-কে কেন্দ্র করে অর্থনীতির নানা কর্মকাণ্ড প্রসারিত হচ্ছে। চিকিৎসা একসময় ব্যক্তিগত দক্ষতার বস্তু ছিল। এখন একে নিয়ে কয়েকশো বা কয়েক হাজার কোটি টাকার ব্যবসা বাংলায় চালু হয়েছে। একই সঙ্গে নতুন যুগে কম্পিউটার ও ইলেকট্রনিকস শিল্প আলাদা করে বাণিজ্যিক শিল্পতালুক গড়ে তুলছে (commercial industrial hub)। বহু জায়গায় কৃষিজ ধান বা অন্যান্য

ফসলের বাজার (hub) গড়ে উঠেছে। গাড়ি শিল্প নিয়ে শিল্পতালুক (industrial estate), মিষ্টান্ন ব্যবসায় নিয়ে শিল্পতালুক, প্রতিমা শিল্প নিয়ে তালুক, বস্ত্র ও চর্মশিল্পের তালুক, হস্তজাত দ্রব্য বা কুটিরশিল্পের বিন্যাস অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে।

ব্যবসা যাতে দ্রুত গড়ে ওঠে, সেজন্য এক জানালা নীতি (single window policy) করে সরকারি লালফিতের জট ছাড়ানো হচ্ছে। ব্যাঙ্কগুলিকে মানুষের ব্যবসার জন্য দ্রুত ঋণ মঞ্জুর করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ব্যবসায় (সরকারি বা যৌথভাবে) পরিচালনার জন্য নানান সমিতি (Board) বা পর্ষদ (Council) গড়ে তোলা হয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রীদের নিয়ে ব্যবসায় স্বাচ্ছন্দ্য আনার জন্য আলাদা কর্মসমিতি (working committee) তৈরি হয়েছে।

ব্যবসায়িক পণ্যদ্রব্য যাতে বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারে সেজন্য জাতীয় রাজপথ (National Highway) এবং বন্দরগুলির পুনর্বিন্যাস হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের ওপর করের বোঝা হালকা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার উঁচুজাতের ব্যবসায়ীমহলকে (Corporate House) নানানভাবে কর ছাড় দিচ্ছেন। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার দুজনে মিলে যদি বাংলার শিল্পে সুপবন বইয়ে দিতে পারেন, তাহলে বাঙালির অর্থনীতি মসৃণ এবং সুফলপ্রসূ হবে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এলে সামাজিক কল্যাণসাধনও হবে। একে বলতে পারি জনকল্যাণের অর্থনীতি (Welfare Economy)।

৪.৬ অনুশীলনী

বিস্তৃত বিশ্লেষণাত্মক উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। ভৌগোলিক পরিচয় বলতে কী বুঝি? এর সঙ্গে রাষ্ট্র, রাজনীতি ও ইতিহাসের সম্পর্ক সূত্রটি বিশ্লেষণ করুন।

২। বাংলার ভূ-প্রকৃতি জলবায়ু এবং লোকপ্রকৃতি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখুন।

৩। বাংলার ভৌগোলিক পরিচয় মূল্যায়ন আপনি কীভাবে করতে চান, তার বিস্তার করুন।

৪। বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নানান গবেষণা ও ধারণায় কীভাবে রূপ পেয়েছে, তার বর্ণনা দিন।

৫। বাঙালি মুসলমানের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় আলাদাভাবে দেওয়ার প্রয়োজন কোথায় এবং তা কীভাবে দেওয়া হবে, তা সংক্ষেপে লিখুন।

৬। সমাজকাঠামোর সংজ্ঞাটি পরিস্ফুট করুন।

৭। বাঙালির সমাজকাঠামো ব্যাখ্যা করুন।

৮। অর্থনৈতিক ভিত্তির সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করুন।

৯। প্রাচীন বাংলার অর্থনীতি সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।

১০। আধুনিক যুগে বাঙালির অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিচয় দিন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। কর্ণসুবর্ণ, পুরাভূমি ও রাঙামাটি বলতে বাংলার কোন কোন অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে?

২। লোকপ্রকৃতি বলতে কী বোঝায় উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩। বৃহৎশিরস্ক জাতি বলতে নৃতত্ত্ববিদেরা কাদের বুঝিয়েছেন?

৪। অতিসম্প্রতি মানুষের আবির্ভাবকাল নিয়ে কী তথ্য পাওয়া গেছে?

৫। প্রাক্ দ্রাবিড় শ্রেণী কীভাবে বাঙালিত্বের সঙ্গে যুক্ত তা আলোচনা করুন।

৬। বাংলায় আদিম মানুষের বংশধর হল উপজাতিরা—এই তথ্যটি ব্যাখ্যা করুন।

৭। গ্রাম্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী কাদের মনে করা হয়?

৮। এখন সমাজে কৃষির চেয়ে কোন কোন অর্থনৈতিক কাজকর্ম বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়?

৯। মধ্যযুগের অর্থনৈতিক কাঠামো সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

১০। বাংলার মুদ্রাব্যবস্থা বলতে ঠিক কী বোঝায়?

৪.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙ্গালীর ইতিহাস,' (আদিপর্ব) বর্তমানে দে'জ সংস্করণ।

২। অতুল সুর 'বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়,' বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা, বিশ্বভারতী।

৩। আহমদ শরীফ 'বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

৪। গোপাল হালদার, 'বাঙালা সাহিত্যের রূপরেখা' প্রথম খণ্ড, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

৫। আশিসকুমার দে, 'মধ্যযুগের আবহাওয়া : বিপন্ন গণকেরা,' ১ম দিয়া সংস্করণ কলকাতা।

মডিউল : ২

বাংলার রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইতিহাস ও সমন্বয় চেতনা

একক ৫ ❑ বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য

৫.২ প্রস্তাবনা

৫.৩ বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)

৫.৪ সারাংশ

৫.১ উদ্দেশ্য

বাংলা ও বাঙালিকে জানতে হলে তার ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইতিহাস যেমন জানতে হয় তেমনই এই সব বিষয়গুলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রাজনৈতিক অবস্থাও জানা প্রয়োজন। তাই এই পর্যায়ে (মডিউল-২) শিক্ষার্থীদের বাংলার প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের রাজনৈতিক ইতিহাসের পরিচয় দেওয়া এই পর্যায়ের দুটি এককের (৫ এবং ৬) উদ্দেশ্য।

৫.২ প্রস্তাবনা

আমরা রাজনীতি ও politics-কে সমর্থক ভাবি। অথচ দুটির মধ্যে অর্থের ফারাক আছে। রাজনীতি হল রাজার নীতি। তা সাম-দান-ভেদ-দণ্ড এই চার ভাবে ব্যবহৃত হত। রাজনীতি বলতে রাষ্ট্রশাসননীতিও বোঝায়। অথচ ইংরেজিতে যখন 'politics' ব্যবহার করি, তখন অর্থটা অনেকটাই পালটে যায় বাংলা 'রাজনীতি'র থেকে। ইংরেজিতে এর অর্থ দাঁড়ায়—১. সরকারি চারুকলা ও বিজ্ঞান ২. রাজনৈতিক নীতি বা আচরণ ৩. শক্তি, মর্যাদার জন্য কার্যপ্রণালী।

আদিতে রাজনীতি বা politics যে অর্থেই চালু থাক না কেন, বর্তমানে এটির অর্থ বিস্তার (extension of meaning) ঘটেছে। রাজা বা শাসকের রাজনীতির পাশে শাসিতের, অধিকারীর সঙ্গে অনধিকারী, সরকার বনাম বিরোধী, উচ্চবর্ণ-মধ্যবর্ণ বনাম দলিত, বড়লোক-গরীব লোক, স্ত্রী বনাম পুরুষ—সব কিছুতেই রাজনীতি আনা হচ্ছে। এর বিপরীতে যখন বলা হয় অরাজনৈতিক বা রাজনীতিহীন (non-political or apolitical) তখন সমস্যায় পড়ি। কাজেই রাজনীতির আওতায় কেউ বাদ যায় না—সরকার সমাজ গোষ্ঠী দল উপদল সমর্থক বিরোধী।

অন্যদিকে রাজনৈতিক ইতিহাস সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল করে ভাবা কঠিন। এক বিশেষ সময়ে সামাজিক অর্থনৈতিক ধর্মীয় চাপে যখন এক বিশেষ রাজনীতির কথা ভাবছি, তখন তার সহযোগী বা প্রতিরোধী রাজনীতি একেবারে ছিল না, এটা বলা যায় না। কেননা রাজনীতি শক্তি, মর্যাদা, অধিকার,

প্রভুত্বের কামনার ইতিহাস—যেখানে দারা-পুত্র-পরিবার তুমি কার কে তোমার। দলীয় রাজনীতির পাশে ব্যক্তিস্বার্থের রাজনীতি (self centred politics) চোখে পড়ে। কখনও ব্যক্তিশাসক বা রাজগোষ্ঠীর রাজনীতি দেখতে পাই, কখনও জনগণেরও। তবে এই জনগণ সবসময়েই নানান স্তরে বিভক্ত থাকে। রাজনীতির আঙিনায় ব্যক্তির জন্য দলীয় রাজনীতি ভেঙে যাচ্ছে কিংবা দলের চাপে ব্যক্তির শ্বাসরোধ হচ্ছে—এই ইতিহাসও পাই। আসলে রাজনীতির ইতিহাস বেশ জটিল তাতে অর্থনীতি সমাজ ধর্মের বিচিত্র টানাপোড়েন, স্বার্থের হানাহানি যেমন প্রবল, তেমনি বিশেষ রাজনীতির জন্য সর্বস্বত্যাগ এমনকি প্রাণের আহুতি দেখতে পাই। শুধু এই নয়, ভাষা নিয়েও রাজনীতি চলে। ভারতে ত্রিভাষা না একভাষা মর্যাদা পাবে, এ নিয়ে পঞ্চাশের দশক থেকে এখনও স্থির সিদ্ধান্ত হয় নি রাজনীতির কল্যাণে, কাজেই বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসকে দেখতে হবে নানা দৃষ্টিকোণ (point of view) থেকে, সরলরেখায় একমাত্রিক স্রোতে ভাসলে চলবে না। যেমন, বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন বা সংস্কারগুলোর জন্য কোনো দলের বা ব্যক্তির যেমন ভূমিকা আছে, তেমনি তা দ্বিধাহীনচিত্তে সকলে মেনে নিয়েছিল এমন ভাবা যায় না। রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, বিদেশি শাসন, একদলীয় বা বহুদলীয় রাজনীতির এই জটিল ক্রিয়াকলাপ ইতিহাসে নিরপেক্ষ থাকে নি। বরং নিত্য নতুন তথ্যের আবিষ্কার বা গবেষণায় আজকের প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যাখ্যান (political interpretation) বদলাচ্ছে। এই রাজনীতির ইতিহাসের ধরতাই বা ছাঁচ তাই সুনির্দিষ্ট থাকে না। গবেষকের দলীয় ভক্তির অদ্ভুত দৈব্যে, সরকারি দাক্ষিণ্য লাভ, প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদার জন্য পালটায়। বাংলার এ জটিল পরিবর্তমান রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে আমরা মুখ ফেরাব। যুগ ধরেই আলোচনা চলবে—১. প্রাচীন ও মধ্যযুগ ২. আধুনিক যুগ।

৫.৩ বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)

বাঙালির প্রাচীন রাজনীতি প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে রাষ্ট্রযন্ত্র কীভাবে সেখানে রূপ নিয়েছিল, তার কথা। এই রাষ্ট্রযন্ত্রের কার্যকলাপ নিয়ে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বা শুক্রাচার্যের শুক্রনীতিসার-এর মতো কোনো বই আমরা পাই না। শুধুমাত্র রাজকীয় দলিলই সম্বল, সাহিত্যরচনার মধ্যেও বিক্ষিপ্ত কিছু তথ্য লাভ করি। পঞ্চম শতকের আগে কিছু জানা যায় না।

গুপ্ত বংশের বাংলা অধিকারের আগে উত্তর ভারতীয় রাষ্ট্রাদর্শ (North Indian Model of State) ছিল না। আর্য রাষ্ট্রবিন্যাসের আদর্শ ও অভ্যাস ধীরগতিতে এলে প্রাদেশিক ও স্থানীয় বিবর্তন (transformation) ঘটল।

কৌম শাসনব্যবস্থা

এক সময় রাজা ছিল না, কিন্তু কৌম সমাজ (community) ছিল। সমাজের নিচু স্তর কিংবা পার্বত্য আরণ্যক কৌমের মধ্যে দলপতি, সামাজিক শাস্তি, আচার ব্যবহার, পঞ্চায়েতী প্রথা, জমি ও শিকার জায়গার (hunting ground) বিলি বন্দোবস্তে, উত্তরাধিকারের শাসনে একটা শাসনতন্ত্রের (administrative machinery) আবছা পরিচয় পাওয়া যায়। আলেকজান্দারের ভারত শাসন

ও মৌর্যাধিকারে এই কৌমতন্ত্র রাজতন্ত্রে পরিবর্তিত হয়েছিল। বাংলার রাজতন্ত্রের আদিকথা মহাভারতের দুয়েকটি কাহিনি এবং সিংহলী পুরাণ দীপবংশ-মহাবংশের বিজয়সিংহের গল্পে লক্ষ করি।

গুপ্ত সম্রাটরা বিজিত রাজ্যকে নিজেদের রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করতেন, কোনো কোনো জায়গায় সামন্ত নরপতি দ্বারা শাসিত হত (feudal chieftains)। তবে সমস্ত বিজিত রাজ্যই কেন্দ্রীয় শাসনকে প্রতিরূপ (model) রূপে দেখতেন। দুজন সামন্ত-নরপতির কথা এসময় বাংলায় শুনতে পাই—১. মহারাজ রুদ্রদত্ত ২. বিজয়সেন। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় বিভাগ ছিল ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল, বীথি গ্রাম এগুলি ছিল ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্রায়িত বিভাগ (smaller divisions)।

ভূমি দান-বিক্রয়, ন্যায়বিচার—এগুলি বিষয়পতিরা বিষয়াধিকরণে দেখতেন। সার্বিক দায়িত্ব বিষয়পতির ওপরে ছিল, তার নীচে থাকতেন নিগম-সভাপতিরা। এদের সহযোগিতার জন্য একটি পুস্তপালের দপ্তর থাকত।

এই রাজতন্ত্র ছিল সামন্তনির্ভর। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পালেদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে চারশ বছর ধরে এক নতুন রাজবংশের সূচনা হল। সামন্ততন্ত্র আরও জোরদার হল। প্রধান রাজপুরুষরূপে মন্ত্রী বা সচিব পদ সৃষ্টি হল। মহাদণ্ড নায়ক (Chief Justice), মহাসন্ধিবিগ্রহিক (foreign minister, defence minister), মহাক্ষপটলিক (Chief Controller of Expenditure, Finance Minister) পদ তৈরি হল। ধর্মের ক্ষেত্রে শাসকবাহু বিস্তৃত হল। বর্ণব্যবস্থা, লোকাচার এই বৌদ্ধ পাল নরপতিরা বহাল রাখলেন।

সেন পর্বে এই একই ব্যবস্থাই চলেছিল। তবে সামন্ততন্ত্র আরও দৃঢ়ভাবে সমাজে তাদের শিকড় প্রোথিত করেছিল। আমলাতন্ত্রের (bureaucracy) পাশে রাজবংশের মর্যাদা মহিমা বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু বিষয়-মহিমা (ভুক্তি থেকে গ্রাম—এই বিভাগ) আর রাষ্ট্রীয় বিভাগ (state division) থাকছে না, তা ভৌগোলিক বিভাগের মতো হয়ে যাচ্ছে।

রাজপুরুষেরা অনেকেই কর্তব্য ও নীতিপালন করতেন। সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি শ্লোকে বিষয়পতির (local adminstrator) লোভহীনতার কথা বলা হয়েছে। তবে মানুষের যে একেবারেই অত্যাচার হত না, সেকথা কবিতার লেখক বলেন নি। রাষ্ট্রের জন্য কর-উপকরও (Tax and other liabilities) কম ছিল না। সমাজের নিচু শ্রেণীর কাছে এই করভার বহন করা সহজ ছিল না।

গৌড়ের স্বাতন্ত্র্য এল পূর্ব দক্ষিণবঙ্গ এবং বর্ধমান অঞ্চলে কেন না ইতোমধ্যে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে হুণ আক্রমণে গুপ্ত রাজারা দিনে দিনে হীনবল হয়ে পড়েছিলেন। ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সপ্তম শতকের মধ্যভাগ অবধি বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করি।

শশাঙ্কের যুগে গৌড়ীতন্ত্র (Gaudism) গড়ে তোলার চেষ্টা ছিল। নতুন নতুন সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্যকে রাষ্ট্র স্বীকৃতি জানিয়েছে। শশাঙ্ক নিজে মহাসামন্ত ছিলেন বলে সামন্তেরা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তবে রাজার ক্ষমতা বা রাষ্ট্র দুর্বল হলে এরা স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন। শশাঙ্ক বৌদ্ধ-বিরোধী

ছিলেন। ফলে রাষ্ট্রের সমাজ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন না। তাঁর শত্রু হর্ষবর্ধন বৌদ্ধধর্মের পরম অনুরাগী ছিলেন। বাংলার পাঁচটি বিভাগেই বৌদ্ধদের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের রমরমা ছিল।

অষ্টম শতকের প্রথমদিকে রাজা ললিতচন্দ্রের মৃত্যুর পর দেশে নৈরাজ্যের (anarchy) সূচনা হয়। রাজার তখন জোর নেই। রাষ্ট্র টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে। অনেকটা অবস্থা হল—আমরা সবাই রাজা। এই সময় রাষ্ট্র পরিচালকরা গোপালদেবকে অধিরাজ নির্বাচন করলেন। শশাঙ্কের পর কোনো রাজা বছরখানেকও রাজত্ব করতে পারেন নি, তাকে নিহত করে অন্যে রাজা হয়েছেন। একশ বছর ধরে এই অরাজকতা চলেছিল। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি থেকে দ্বাদশ শতকের শেষদিক পর্যন্ত পালবংশ রাজত্ব করেছিল। এরা কেউ উচ্চবর্ণের ছিলেন না। ধর্মপাল (৭৭৫-৮১০) সুদূর রাজস্থান, পাঞ্জাব, কনৌজ অঞ্চল জয় করে উত্তর ভারতে স্বরাট হয়ে ওঠেন। তার পুত্র দেবপাল উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজ এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। পরে দশম শতাব্দীতে মহীপাল (৯৭২-১০২৭) পাল সাম্রাজ্যের হারানো সম্মান পুনরুদ্ধার করলেও চারশ বছরের পাল রাজ্য ও রাষ্ট্র একেবারে ভেঙে গেল। পাল রাষ্ট্রের ভিত ছিল সামন্ততন্ত্র এবং তার মধ্যেই ছিল তার দুর্বলতার বীজ। দেবপালের পর বিজিত রাষ্ট্রেরা স্থানীয় আত্মকর্তৃত্ব (local self administration) নিয়ে পাল সাম্রাজ্য ভেঙে দিয়েছিল। লৌকিক সমস্ত আচরণই বিভিন্ন কর্মচারীর অধীনে ছিল। ফলে ক্ষমতার কেন্দ্রায়ন (centralisation) ঘটেছিল।

কর্ণাট থেকে আসা রাঢ়ভূমিতে বসতকারী সেনবংশের সামন্ত সেন এর ছেলে হেমন্ত সেন মহারাজাধিরাজ হয়েছিলেন। বিজয় সেন বল্লাল সেনের পর লক্ষ্মণ সেনের সময় অবধি (১১৭৯-১২০৬) সেনবংশ রাজত্ব করেছিলেন। লক্ষ্মণ সেন পুরী, বেনারস ও প্রয়াগে বিজয়স্তম্ভ গড়েছিলেন। তাঁর প্রায় সাতাশ বছরের শাসনকালে রাজ্য ও রাষ্ট্র ক্রমে হীনবল হয়ে উঠেছিল। ফলে ভাগ্যান্বেষী সেনানায়ক বখতিয়ার খিলজী বাংলা অধিকার করলেন ত্রয়োদশ শতকের সূচনাতেই। ইতিহাসের দিক থেকে এবং রাজনীতির মধ্যযুগ (medieval period) শুরু হল।

মধ্যযুগের সূচনা/রাজনৈতিক প্রবাহ

লক্ষ্মণ সেন নদীয়া থেকে পূর্ববাংলায় পালিয়ে গেলেন। এখানে সেনবংশ রাজত্ব চালাল আরও বছর পঞ্চাশ মতো। খিলজির রাজনৈতিক অভিসন্ধির চেয়ে বড় ছিল লুঠপাট চালানো। কিন্তু রাজনীতির দিক থেকে এই ঘটনার গুরুতর তাৎপর্য লক্ষ করা যায়।

খিলজি সত্যিকারের বঙ্গবিজেতা নন। কারণ সেনবংশের রাজারা তেরো বছর স্বাধীন রাজত্ব চালান। আবার ত্রিপুরার হরিকালদেব সামন্ত হলেও স্বাধীনভাবে রাজত্ব পরিচালনা করতেন। মুসলমান শাসনের লখনৌতি রাজ্য বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হল। এটি পরে গৌড়-সুলতানিয়তে পরিণত হয়। তিনি বৌদ্ধমঠ হিন্দু মন্দির ধ্বংস করলেও মাদ্রাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ মুসলমানের সংখ্যা না বাড়ালে সদ্য তৈরি মুসলিম রাষ্ট্র টিকবে না, এটা তিনি অনুভব করে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন।

আলি মর্দান সরকারিভাবে এই অঞ্চলের শাসনভার পাওয়ার পর তিনি আমীর ও হিন্দু প্রজাদের উপর অসহ্য অত্যাচার করেন। এখানে তাকে সাহায্য করেছিল সদ্য আনা তুর্কি বাহিনী। অর্থাৎ তুর্কি গোষ্ঠী খিলজিদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল।

পরে সুলতান কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর (১২১০) তুর্কি সাম্রাজ্য চার টুকরো হয়ে যায়। আলি মর্দান প্রথম সুলতান উপাধি নেন। পরে তুর্কি-খিলজি আমীরদের হাতে তিনি নিহত হন।

অন্যদিকে পূর্ববঙ্গে সেনরাজারা মুসলিম ভয়ে ত্রস্ত থাকতেন। লক্ষ্মণ পুত্র কেশব সেনের গৌড় ত্যাগ এবং বিশ্বরূপ সেনের 'গৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ প্রমাণ করে যে তারা স্বাধীন রাজাই ছিলেন।

বাংলার সংঘবদ্ধ মুসলমান সমাজের বিরোধিতা যে কঠিন তা ইলতুৎমিস জানতেন। তবু অযোধ্যায় হিন্দু বিদ্রোহের সুযোগে তিনি পুত্র নাসিরউদ্দিনের সাহায্যে লখনৌতি দখল করেন।

প্রায় ষাট বছর (১২২৭-১২৮৭) বাংলাদেশ দিল্লীর সুলতানিয়তের অধীনে থাকে। পঞ্চাশ জনের মধ্যে দশজন শাসনকর্তাই ছিলেন সুলতানের ক্রীতদাস 'মামলুক'। এদের শাসনকালে রাজদরবার ঐশ্বর্য ও আড়ম্বড়ের শীর্ষে উঠেছিল। অথচ ক্ষমতার জন্য আমীর ওমরাহদের প্রতিযোগিতা ও হানাহানি প্রকট। অরাজক চেহারা নিয়েছিল। এ যুগে একটা রাজনৈতিক রীতি গড়ে ওঠে—লখনৌতির শাসককে হারাতে পারলে তিনি সারা বাংলার মর্যাদা ও ক্ষমতা ভোগ করবেন। কিন্তু প্রজারা ধর্মনির্বিশেষে এ নিয়ে মাথা ঘামাত না। মুসলিম শাসক ও হিন্দু শাসিতের মধ্যে সহযোগিতাও গড়ে উঠল। উত্তর ভারতের উদ্বাস্তু হিন্দুরা বাংলায় আশ্রয় সন্ধানে আসত। তাদের সঙ্গে মুসলিমদের সংঘাত বাঁধত। কিন্তু পরে বিদ্বেষ কমে যায় এবং হিন্দুরা সরকারি মর্যাদায় অভিষিক্ত হন।

দিল্লী থেকে বাংলায় এসে হাজী ইলিয়াস শাহ ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে লখনৌতির বদলে বাঙ্গালার রাজ্য এবং ইলিয়াসী শাহী বংশের সূচনা করলে তারা প্রায় দেড়শ বছর মর্যাদার সঙ্গে এখানে রাজত্ব করেন। একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় নীতি গৃহীত হয়েছিল। হিন্দু কর্মচারীরা অভিজাত সম্প্রদায়ের পত্তন করল যার পরিণতিতে গণেশের উদয়, নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা (১৪১৪)। মুসলিম সাধু সন্ত, মোল্লা উলেমারা বিরুদ্ধে গেলে জৌনপুরের সুলতান বাংলা দখল করলেন। গণেশের পুত্র যদু ধর্মান্তরিত হন। ফলে এক ধর্মান্তরিত রাজবংশের রাজত্ব শুরু হল। ক্রীতদাসেরা সুলতানকে হত্যা করে এবং পরে আমীর-ওমরাহরা ১৪৪২ ইলিয়াস শাহী বংশের একজনকে সিংহাসনে বসান। হাবসী খোজাদের আমদানি করার পর তারা ১৪৪৭ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন দখল করে। সুলতানিয়কে রক্ষার পরিবর্তে হাবসীরা (Abyssinians) প্রভু হয়ে পঞ্চাশ বছর প্রায় শাসন চালান। সকলে এদের বিরুদ্ধে গেলে উজীর হুসেন শাহ ১৪৯৪ নাগাদ এক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়ে সুশাসন, সুসংস্কৃতি, ন্যায়রাজকতা, গৌড় রাজ্য ছিল শত্রু দিয়ে ঘেরা। লোদীদের পরে মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা হলে তা বাংলার নিরাপত্তায় বাধার সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক স্থিরতা (political balance) এবং উদার রাষ্ট্রনীতির ফলে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিত্তি ও বিনাশ সংগঠিত হয়েছিল। সংস্কৃতি ও রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে এক আলাদা চেহারা নেয়।

হুমায়ুনের আগ্রাসী মনোভাবের গুজব প্রচলিত হওয়ায় বাংলায় রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। পরে রাজ পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে কর্মচারী, শাসনকর্তারা স্বাধীন আচরণ শুরু করেন। এই সময় বাংলাকে আফগান শের খাঁর আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পর্তুগীজদের সাহায্য নেওয়া হয়। ১৬১৭ নাগাদ পতুর্গীজরা চট্টগ্রামে ঢোকার অনুমতি পায়। এর পর তারা ব্যবসা ও কুঠি গড়ার অনুমতি পেল। বিদেশি বাণিজ্যশক্তি এভাবে আসায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (political stability) বিপন্ন হল। ১৫৩৮-এ শের খাঁ বাংলা দখল করলেন। বাংলা স্বাধীনতা হারাল, রাজনৈতিক অরাজকতা ও অনিশ্চয়তা চলল সপ্তদশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছর অবধি।

১৫৭৬ থেকে ১৫৯৪ পর্যন্ত মোগল-আফগান লড়াই চলতেই থাকে। বাংলা জয় করতে তাই মোগলদের লাগল ১৫ বছর। আকবর এ বাংলার সেনাপতি ও শাসনকর্তারূপে মানসিংহকে নির্বাচন করার পর ১৫৯৫-এ তিনি (মানসিংহ) রাজমহলে বাংলার রাজধানী স্থাপন করে 'ভাঁটি' বা পূর্ববাংলায় অভিযানে যান। বারভুঁইয়ারা হেরে যাওয়ার পর ঢাকা হল রাজধানী।

রাজনৈতিক শান্তি ফিরে এল শাহজাহান এখান থেকে যাওয়ার পর যে বিদ্রোহী রূপে বাংলা দখল করেছিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে জাহাঙ্গীরের আমল হল যুগান্তকারী। প্রজাদের সঙ্গে সম্রাটের যোগাযোগ ছিল সামান্য। মীরজুমলার শাসনে মোগল প্রশাসন ভেঙে পড়ে। প্রজাদের ওপর চরম অত্যাচার চলে। শায়েস্তা খাঁর আমলে আবার রাজনৈতিক স্থিতি ফিরে আসে। ঔরঙ্গজীবের সময় চট্টগ্রাম অধিকার করে নাম দেওয়া হল ইসলামাবাদ।

শাহজাহানের আমলে পতুর্গীজদের সঙ্গে মোগলদের সদ্ভাব খুঁজে পাওয়া যায় না। ঔরঙ্গজীবের সময় মোগলদের সঙ্গে ইংরেজরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল। পরে শান্তি এলে জোব চার্ণক আসেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষ হয়ে। কলকাতা ও পাশের এলাকায় ইংরেজ জমিদারি প্রতিষ্ঠিত হল। বণিকের মানদণ্ড শেষে রাজদণ্ডরূপে দেখা দিতে লাগল। ১৩৫৬-তে ডাচ বণিকরা চুঁচুড়া বাণিজ্য কুঠি, পরে দুর্গ গড়ে তোলে। অর্থাৎ সপ্তদশ শতক শেষ হওয়ার আগে ইউরোপীয় জাতির বাণিজ্য সভ্যতা বাংলায় বিস্তৃত হয়েছিল।

শোভাসিংহ ও রহিম খাঁ ১৬৯৫-৯৬ সালে বিদ্রোহ করে। একে উপলক্ষ্য করে ইংরেজ, ফরাসি ও ডাচ বণিকরা বিদেশি কুঠিগুলিকে বাঙালির আশ্রয়স্থল (shelter) রূপে গড়ে তোলে।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি ১৭৪০ নাগাদ আলিবর্দী খাঁ স্বাধীন নবাব হতে পেরেছিলেন। বাংলায় এ সময় মারাঠা বর্গীদের অভিযান এবং লুঠতরাজ বাঙালিকে এক রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মুখোমুখি করে। ফলে উড়িষ্যা থেকে মেদিনীপুর অবধি বিরাট অংশ বাংলার নবাবীর হাতছাড়া হল। পশ্চিম বাংলার নানান সম্প্রদায় ও বিভিন্ন পেশার মানুষ নিরাপদে থাকবে বলে কলকাতায় এল। ইংরেজ সরকার এসময় তাদের সাহায্য করেছিল। মারাঠা আক্রমণ এবং পরে পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) বাংলার রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। কোম্পানির শাসন, নবাবী শাসন—এই দ্বৈত ব্যবস্থা এই শতকের শেষ দিকে পুরোপুরি ইংরেজের অধীনে চলে গেল।

৫.৪ সারাংশ

আলোচনার শেষে সংক্ষেপে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার উল্লেখ করা যায়। বাঙালির রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে প্রাচীন ভারতে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। মহাভারত বা অন্যান্য দু'একটি গ্রন্থে শুধু 'বঙ্গ'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। গুপ্তবংশ বাংলার শাসন ব্যবস্থায় আসার আগে বাংলার রাষ্ট্রাদর্শ সম্পর্কে তেমন স্পষ্ট কোনো কিছু জানা যায় না। পরে শশাঙ্কের রাজত্বকাল গৌড়-বঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন বঙ্গদেশে কৌম শাসন ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। গুপ্ত রাজারা বাংলার শাসন ব্যবস্থায় আসার পর এখানকার শাসন ব্যবস্থায় সামন্ত-নির্ভরতা দেখা দিয়েছিল। তবে অষ্টম শতক নাগাদ পাল বংশের সূচনা থেকে ত্রয়োদশ শতকে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকাল পর্যন্ত প্রাচীন যুগের অবস্থা বলা যায়। বখতিয়ারউদ্দিন খিলজির বাংলা আক্রমণ ও লক্ষ্মণ সেনের পূর্ববঙ্গে চলে যাওয়ার পর থেকেই 'মধ্যযুগ' ধরা হয়ে থাকে। তারপর ক্রমশ ইসলামি শাসন ব্যবস্থার সূচনা ও দীর্ঘকাল তার স্থিতি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনভার নেওয়া পর্যন্ত। এভাবেই বাংলার রাজনীতিতে আধুনিক যুগের সূচনা।

একক ৬ ❑ বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস (আধুনিক যুগ)

গঠন

৬.১ উদ্দেশ্য

৬.২ প্রস্তাবনা

৬.৩ বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস (আধুনিক যুগ)

৬.৪ সারাংশ

৬.১ উদ্দেশ্য

পূর্ববর্তী এককে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই এককে অদূর অতীতের রাজনীতিবিদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটানোর চেষ্টা করা হবে।

৬.২ প্রস্তাবনা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ইংরেজদের শাসনের যুগ থেকে বাংলার রাজনীতির আধুনিক যুগের সূচনা, বলে থাকেন ঐতিহাসিকগণ। ১৭৫৭ সালের পর নবাবি শাসনের অবসান ঘটে। ইসলামি শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়। ১৮৫৭ সালের পর কোম্পানির শাসনের পরিবর্তে ইংলন্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীন হয় বাংলা। এই দুশো বছরের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণবহুল। ইংরেজদের সাহচর্যে বাঙালির মনে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ, স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সূচনা হয়। তার সঙ্গে দুটি বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব বাঙালির উপর পড়েছিল। তারপর স্বাধীনতা, দেশ ভাগ প্রভৃতি সমস্যায় বাঙালির ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়েছিল। বর্তমান আলোচনায় স্বল্প পরিসরে তার সামগ্রিক পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হবে এই এককে।

৬.৩ বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস (আধুনিক যুগ)

আধুনিক যুগ এক বিশাল পর্ব—প্রায় দুশো বছরের বেশি সময় ধরে ব্যাপ্ত এই রাজনৈতিক গতিপথ সংক্ষেপে আলোচনা করা কঠিন। আমরা তাই রাজনৈতিক ইতিহাসের বাঁকগুলো এবং তাদের বৈশিষ্ট্য অল্প কথায় বলার চেষ্টা করব।

১৭৫৭-র পর থেকে ইংরেজরা নবাবী ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক হয় এবং কেন্দ্রীয় মোগল শাসনের অনুগ্রহ নিলেও ১৮৫৭-য় সিপাহী বিদ্রোহের পরের বছর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটেনের রাজকর্তৃত্ব বাংলার শাসনের নিয়ামক হল। ধীরে ধীরে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের আড়ালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারত শাসন করতে শুরু করল। বাঙালি সেই মুহূর্তে ইংরেজের চালিকাশক্তির সাহায্যকারী হওয়ায়

কলকাতা রাজধানীতে রূপান্তরিত হল বিশ শতকের প্রথম দশক অবধি। আসলে এই বিরাট সময় জুড়ে প্রকৃত অর্থে প্রথমে ছিল দ্বৈত শাসন (diarchy) ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানি এবং নবাবী আমল, তারপর কোম্পানি আমল (১৭৫৭ অবধি), এরপর এল ব্রিটিশ রাজশাসন যা চলেছিল ১৯৪৭ অবধি। সিরাজের পর মীরজাফর-মীরকাসেম রাজত্ব করলেও তা ছিল নিয়ন্ত্রণের শাসন, কোম্পানিই সবকিছু আড়ালে থেকে চালাত। মীরকাসেম বিদ্রোহী ও পরাজিত হলে নবাবী আমল ভেতরে ভেতরে শেষ হয়ে যায় (inwardly crumbling)। কোম্পানি কর্মচারীদের অত্যাচারের বাড়াবাড়ি শেষ অবধি কোম্পানি ও সনদদাতা ইংরেজ সরকারের মধ্যে সমঝোতার অভাব গড়ে তোলে। বিশেষ করে সিপাহী বিদ্রোহ স্বভাবত সামন্ত উত্থানের (rise of feudal restoration of power) হলেও ইংরেজ শাসন সরাসরি এল ১৮৫৮-য় রানী ভিক্টোরিয়ার আমলে।

এই একশ বছরের কালসীমায় বাঙালির রাজনৈতিক চরিত্র এবং জনচেতনার খানিকটা পরিমাপ করা দরকার। কোম্পানি শিক্ষা ও অন্যান্য সংশয় বিধি নেওয়ার ফলে বাঙালির একাংশ তাদের সমর্থন করছিল। কোম্পানি এবং পরে ইংরেজ শাসনের চেষ্টা ছিল এক ইংরেজি সভ্যতা-সংস্কৃতি-ধর্মের অনুরাগী ভক্ত গড়ে তোলা, শাসনকাজের জন্য একটা কেরানি শ্রেণীর জন্ম দেওয়া। এর মধ্যে সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ রদ যেমন চালু হয়েছে, তেমনি১৮৩০-এর দশকে ফার্সির রাজভাষার মর্যাদা চলে গেল। ফলে ফার্সির চেয়ে ইংরেজি পড়ায় ঝোঁক বাড়ল। বেশ কতকগুলি বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল—চুয়াড়, পাইক, সাঁওতাল এবং নীল বিদ্রোহ সর্বোপরি সিপাহী বিদ্রোহ। এদের মধ্যে নীল বিদ্রোহ (যা ছিল নীল কুঠিয়াল ও কোম্পানির বিরুদ্ধে) একটা ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। এইসব দ্রোহবোধ (sense of rebellion) নিয়ে নানান ব্যাখ্যার মতান্তর আছে।

স্কুল-কলেজ (যেমন ১৮১৮-তে হিন্দু যা পরে প্রেসিডেন্সি) বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭) শিক্ষা প্রসার করার পর ১৮৮০ নাগাদ বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর (middle class) উদ্ভব হল। রাজনৈতিক চেতনা, গণতন্ত্রের জন্য আর্তি, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ধিক্কার ধ্বনিত হতে লাগল। ১৮৮৩ নাগাদ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হল, এর নেতৃত্বেও ছিলেন বাঙালিরা। জাতীয়তাবাদ বিকশিত হল। সাহিত্যে তার ছায়া পড়ল একটু বক্রভাবে।

কেননা এই পর্বে (১৮৮০-১৯১০) অবধি বাঙালির ধারণা হয়েছিল মোগল শাসনের মতো ইংরেজ শাসন তাদের ঐতিহ্য থেকে ভ্রষ্ট করছে। তাই তারা এমনকি সৃজনশীল মানুষও মুখ ফেরাল হিন্দু সুবর্ণ যুগের দিকে। একটা হিন্দু পুনরুত্থান (Hindu revivalism) দেখা দিল। অনেকের মতে, রবীন্দ্রনাথও অন্যদের মতো এ সময় হিন্দুত্ববাদী হয়ে উঠেছিলেন (ড. আশিস নন্দী প্রমুখ)। হয়তো এই আলোচনা অনেকের কাছে আপত্তিকর মনে হবে। কিন্ত সমকালীন রাজনীতির আবহাওয়ায় রবীন্দ্র-উক্ত 'সত্য যে কঠিন' উক্তি শিরোধার্য করছি।

আমাদের পক্ষে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের পুরো পরিচয় দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কেননা অজস্র বিতর্ক, মতান্তর, ব্যক্তি ও শ্রেণীস্বার্থ সেখানে জড়িয়ে আছে। আমরা সেইজন্য ১৮৮৫ থেকে ১৯৪৭-এর

প্রেক্ষাপট বিচার করব। হয়তো ১৯৪৮-এর বঙ্গভঙ্গ, ১৯৭১ বাংলাদেশ গঠন, সুদীর্ঘ কংগ্রেসী জমানার পরে ১৯৬৭-এর যুক্তফ্রন্ট, বামফ্রন্ট সরকারের তিন দশক এবং পরবর্তী অধ্যায় সুচিবিদ্ধ করার চেষ্টা করব। সেখানে তথ্য প্রদানের মরিয়া চেষ্টা না থেকে মূল রাজনৈতিক ঘটনাগুলি সূত্রাকারে বিন্যস্ত করব।

কেন আমরা ১৮৮৫ থেকে আলোচনায় যাচ্ছি কারণ ইতিমধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয় হয়েছে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক বা রাজনীতি-ঘেঁষা সামাজিক আন্দোলনে এদের যোগদান বাংলার রাজনীতির নতুন দিকচিহ্ন হয়ে উঠেছে। এখানেও ঘটনার সংখ্যা গণনাহীন, ব্যাখ্যার ভিন্নগামিতা মাঝে মাঝে দিকভ্রষ্ট করে। এই পর্ব থেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত রাজনীতির দোলাচল এবং তথ্য-তত্ত্বের বিশাল ভাণ্ডারে আমরা এখনও নিশ্চিন্ত ধারণা করতে পারি নি। এই ব্যাখ্যান কর্মে তাই আমাদের আশ্রয় হবে সাধারণভাবে রাজনীতির প্রাঙ্গণে বিমুগ্ধ এক পদচারণের ইচ্ছা। তাই বিশেষ কোনো রাজনীতির পথপ্রান্তে আমরা সম্বল করব না। মুক্তমনা সাধারণ পাঠক যেভাবে রাজনীতির জল সতর্ক তর্জনীতে মাপে, সেই প্রয়াসই এখানে থাকছে।

১৮৮০-এর দশক ও মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক চেতনা

১৮৮০ নাগাদ ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যা ভারতে দাঁড়িয়েছিল ৫৪০০০-এর কাছাকাছি। ১৮৮৬-৮৭ সালে বাঙালি শিক্ষিত নেটিভের সংখ্যা ছিল ১৬৬৩৯। এই মধ্যবিত্তদের বিচার করতে হবে তাদের সামাজিক ভিত্তির দিক থেকে। এদের মধ্যে নবজাগরণের স্পর্শ লেগেছিল। একই সঙ্গে সংস্কারচেতনা, গণতান্ত্রিক আন্দোলন তৈরি হয়েছিল।

উপজাতীয় অঞ্চল ছাড়া মহাজন বিরোধী সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল। জমিদারদের কোনো উৎপাদিকা শক্তি ছিল না। ফলে জমিদারদের সঙ্গে রায়তদের বিরোধ সংঘাত হল পাবনা থেকে। ১৮৭৩ চাষীরা সংঘ গড়ল, খাজনা বন্ধ করল। এক দশক ধরে এই আন্দোলন ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। এই আন্দোলন বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। ইংরেজ প্রভাবিত ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র হিন্দু পেট্রিয়ট একে হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে মুসলিম কৃষক আন্দোলন রূপে চিহ্নিত করেছিল। এটি কোনোভাবেই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে দেখা যায় না। কারণ ঈশানচন্দ্র রায়, শম্ভু পাল এরাও নেতৃত্বে ছিলেন। আসলে স্বত্বভোগী প্রজার সঙ্গে নিঃস্বত্বভোগী প্রজার বিরোধ, জমিদারী শোষণ, শাসকের পক্ষপাতদুষ্টতা এই অবস্থার সৃষ্টি করেছিল।

সাম্প্রতিক সমাজতান্ত্রিক বিবরণ অনুযায়ী বাঙালি জাতি বিভিন্ন ধরনের পেশাগত ঐক্য, লোকাচার, প্রথা দ্বারা বাঁধা ছিল। বিশ শতকের প্রথম দিকে নিচু জাতের মানুষরাও সংঘ স্থাপন করল। গড়ে উঠল সচ্ছল কায়স্থ, মাহিষ্য সংগঠন। ব্রিটিশরা নমঃশূদ্রদের মধ্যে বিভেদ ও শাসনের নীতি ফলপ্রসূ করল। তাদের মনে হল যে উঁচু জাতের শোষণ তাদের মতো অস্পৃশ্যদের কাছে ব্রিটিশ প্রভুর চেয়ে বেশি বড়ো শত্রু।

অন্যদিকে গড়ে ওঠানো হল হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা। দ্বিজাতিতত্ত্ব খাড়া করা হল।

১৯০৫-১৯০৮ অবধি চলল স্বদেশী আন্দোলন। ১৯০৫-এ প্রস্তাবিত বাংলাদেশকে দু-ভাগে ভাগ করার বিরুদ্ধে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন শুরু হল। নরমপন্থী বুদ্ধিজীবীরা সাংবাদিক সভা, সাধারণ সভা এবং আবেদনপত্রের পথ নিল। ১৯০৪ ও ১৯০৫-এ কলকাতা টাউন হলের সমাবেশে জেলার মানুষরাও যোগ দিলেন। বিলাতী দ্রব্য বর্জনের ডাক এল কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় (১৯০৫ জুলাই), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী একে সমর্থন জানালেন। রাখীবন্ধনের ডাক দেওয়া হল। ১৯০৭-এ অরবিন্দ ঘোষ স্বরাজ বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার ডাক দিলেন।

স্বদেশী শিল্প, জাতীয় বিদ্যালয়, গ্রাম উন্নয়নের কাজ শুরু হল। প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নীলরতন সরকার, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ডন পত্রিকা), রবীন্দ্রনাথ, অশ্বিনীকুমার দত্ত এরা ব্যবসা-বাণিজ্য, গ্রামোন্নয়নে জোর দিলেন। ১৯০৭ নাগাদই পরোক্ষ প্রতিরোধের নীতি নিয়ে প্রবন্ধাদি বেরোল। আস্তে আস্তে সংসার বিরক্ত জাতীয়তাবাদী নরমপন্থার বদলে চরমপন্থার কথা ভাবা হল। বিভিন্ন সমিতি গড়া হল চরমপন্থী কার্যকলাপের জন্য। একই সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে মিশে গেল ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন। একদিকে এল আধুনিকতা, অন্যদিকে হিন্দু পুনরুত্থানবাদ। শিবাজী উৎসব করে চরমপন্থীরা মূর্তিপূজার প্রচলন করলেন। বন্দে মাতরম, সন্ধ্যা কিংবা যুগান্তর পত্রিকায় চরম এবং আক্রমনোন্মুখ হিন্দুত্ব দেখা দিল।

মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী জাতীয় নেতৃত্বে উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালালেও তাঁর এসব কাজকর্ম এবং সত্যাগ্রহ অহিংস আন্দোলন বাঙালি মনে ততটা ছাপ ফেলে নি যতটা নরমপন্থী ভাববাদী ও ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদ গাঢ় প্রভাব ফেলেছিল।

বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লব প্রচেষ্টা জাতীয় সংগ্রামে ছাপ ফেলেছিল। ব্রিটিশরা যথেষ্ট ভয় পেয়েছিল, মৃত্যুঞ্জয়ী স্বাধীনতার মন্ত্র, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ আশ্রয়, অস্ত্রশস্ত্র একটা নতুন রাজনৈতিক আবহাওয়া গড়ে তুলছিল যদিও কংগ্রেস ১৯৩০-এর আগে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি।

দুটো মহাযুদ্ধের অভিঘাত বাঙালির রাজনৈতিক জীবনে সমান ভাবে পড়েনি। প্রথম মহাযুদ্ধে অনেক বাঙালিই ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে শৌর্যের আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। যদিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বাঙালির যোগদান ঘটলেও তার অভিঘাত বাঙালি সমাজকে নতুন এক পরিবর্তনের মুখে দাঁড় করিয়েছিল। সেখানে সামাজিক মূল্যবোধ বিধ্বস্ত, নারীর সম্ভ্রম কানাকড়িতে কেনা যায়, আর্থিক বিপর্যয় চরম আবার যুদ্ধের পরাক্রমে কলকাতা কিংবা শহরাঞ্চল ত্যাগের হিড়িক দেখা দিল। ১৯৪২-এ সাইক্লোন, মন্বন্তর বাঙালির আর্থিক জীবন, নিশ্চিন্ত আশ্রয়, অন্নের নিশ্চয়তা থেকে বঞ্চিত করল। ১৯৪২-এ বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় 'জাতীয় সরকার' প্রতিষ্ঠিত হল। এগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তার জন্য আমাদের বিশ্বাসঘাতকতা, উদাসীনতা কিংবা ইংরেজ প্রীতি কোনটি বেশি দায়ী বলা কঠিন।

ভারতে বা বাংলায় ইংরেজ বিদ্বেষ এবং বিদ্রোহ যখন তীব্র, তখন সুভাষ চন্দ্র বসু বা নেতাজী ব্রিটিশ

বিরোধী জাপান ইত্যাদি সরকারের সহযোগিতায় ভারতীয় জাতীয় সেবা (Indian National Army বা INA) গঠন করে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ভারতের মণিপুর, বর্মার রেঙ্গুন পর্যন্ত তিনি অধিকার করে বাঙালির সামরিক ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ফলে জনগণ ও কংগ্রেস তথা গান্ধীর দেশব্যাপী আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ, নেতাজীর সামরিক অভ্যুত্থান—সব মিলে ব্রিটিশ সরকারের ভারত ছাড়ো ত্বরান্বিত করেছিল। ১৭৫৭ থেকে বিস্তৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষমতার অপসারণ ঘটল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট।

কিন্তু এই স্বাধীনতা বাঙালিকে কোনো স্বস্তির স্তরে পৌঁছে দেয় নি। কারণ পাঞ্জাবের মতো বাংলাকেও ধর্মের ভিত্তিতে দু-টুকরো করে পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হল। লক্ষ লক্ষ মানুষ পূর্ব বাংলা থেকে ভারতে পশ্চিমবাংলায় চলে এল। উদ্বাস্তুর স্রোতে যেমন অর্থনীতির বেহাল দশা ঘটল তেমনি দেশছাড়া মানুষকে নিয়ে নতুন রাজনীতি শুরু হল। অনেকে মনে করেন কংগ্রেস দেশভাগ না মেনে নিলে এত কিছু ঘটত না। ইতিমধ্যে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে অনেকগুলি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটল—যার চরম পরিণতি ১৯৪৬-এর দাঙ্গায়। হিন্দু-মুসলিমরা প্রিয়জনদের হারাল, অখণ্ড রাষ্ট্রীয় চেতনা লুপ্ত হয়ে গেল, অসংখ্য মৃতদেহের উপর গড়ে উঠল দুটি রাষ্ট্র। এর জন্য শুধু ব্রিটিশের দ্বিজাতিতত্ত্ব (two nation theory) দায়ী নয়, বরং বলা ভালো রাজনীতি করার এক চরম ফলাফল আমাদের ভুগতে হল। আজকে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিমের কবলমুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ হলেও, সেখানের বাঙালি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি পেলেও মৌলবাদ সেখানেও ঐশ্লামিক রাষ্ট্রের জিগির দিচ্ছে।

৬.৪ সারাংশ

রাজনৈতিক উত্থান পতন সবদেশেই চলে। বাংলাদেশেও উত্থান পতন ঘটেছে এবং ঘটবে। তবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমস্ত তথ্য সবসময় না পাওয়ায় আমাদের কাছে অনেক কিছুই অজ্ঞাত থাকে। বাংলায় রাজনীতির আধুনিক যুগ ঘটনাবহুল। আলোচনায় দেখলাম, বাংলার রাজনীতি আজও সমান চঞ্চল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনযন্ত্রে প্রবেশ ও পরবর্তী নানান ঘটনায় বাংলা বিপর্যস্ত। স্বাধীনতা লাভ, দেশ ভাগ, অখণ্ড বাঙালি জাতির জীবনে একই সঙ্গে স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন ডেকে এনেছে। আমরা সুদিনের প্রত্যাশায় অপেক্ষমান।

একক ৭ ❑ বাংলায় বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য

৭.২ প্রস্তাবনা

৭.৩ বাংলার বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম

৭.৪ সারাংশ

৭.১ উদ্দেশ্য

সমাজবিধি, রাজনীতি, অর্থনীতি যেমন মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত তেমনই 'ধর্ম' ব্যাপারটিও মানুষের অন্যতম নিয়ন্ত্রক। অন্যান্য জাতির মত বাঙালিও ধর্মকে কেন্দ্র করে টিকে আছে। যেখানে বিভিন্ন ধর্ম বাঙালিদের মধ্যে বহমান। বিভিন্ন প্রধান ধারা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করাই এই এককের উদ্দেশ্য।

৭.২ প্রস্তাবনা

বাঙালির ধর্মচেতনার একটা সরল ছবি আঁকা সম্ভবপর নয়। ধর্মকর্মের জীবন প্রতিদিনের জীবন আলোচনার থেকে অনেক কঠিন। কেন না ধর্ম ও তার লোকাচার, বিশ্বাস এবং সংস্কার বর্ণ শ্রেণী জাতিভেদে আলাদা হতে বাধ্য। একে অনেকটা বহুস্তরীয় (multi level) বলা যেতে পারে। ধর্ম ছাড়াও দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি বিশ্বাস যোগাচার কিভাবে তাদের ভাবনা থেকে মূর্তি, মন্দিরে রূপায়িত করল, সেটা জটিল বিষয়। অনেক সময় ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসে পূজা উদযাপন একটা সমষ্টির, বারোয়ারির রূপ নিয়েছে। সেখানেও ধর্মাচরণ এক হতে পারে, ভক্তি বিশ্বাসের পাত্রবদল ঘটতে থাকে। আবার এর সঙ্গে সামাজিক ক্ষমতার যোগাযোগ থাকে। যারা সমাজে ক্ষমতাশালী, তাদের ধর্মই একটা স্তরে পৌঁছয় যা অন্যদের প্রভাবে ফেলে। অর্থাৎ ধর্মের জগতেও একটা অতিক্ষমতাবান, মধ্যক্ষমতাবান কিংবা ক্ষমতাহীনতার লীলা দেখা দেয়। আবার রাজধর্ম হিসেবে যা বলবত্তর, তা প্রজাদের অনুসরণযোগ্য মনে হয়। রাজারা বৌদ্ধ হলে দেশে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ, অনুরাগ, পূজাস্থল বা বিহার নির্মাণ, ভিক্ষুর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। আবার রাজধর্মের বদল হতে পারে। আবার রাজধর্ম হলেই তা প্রজার ধর্ম না হয়ে দুটি স্রোত বইতে থাকে—একটি রাজধর্মের, অন্যটি লোকধর্মের। এদের মিশ্রণও ঘটতে পারে, যাকে আমরা সমন্বয় বলতে পারি। এমনও হতে পারে একটি ধর্মের স্রোতে অন্য ধর্মেরা মিলে গিয়ে নবরূপে প্রকাশ পেল। তখন আদি ধর্মের লক্ষণগুলি গণনা করা দুষ্কর হয়ে ওঠে। বাংলায় ধর্মচেতনার আলোচনায় এই সামান্য কথামুখটি সম্প্রসারিত হতে পারত নানান তথ্যের জটিলতায়। আমরা বরং আলোচ্য তিনটি ধর্মের বদ্ধীকরণ উপলক্ষে এই মিশ্রণ বা সমন্বয়ের অনুপাত ধরার চেষ্টা করব।

৭.৩ বাংলায় ধর্ম

(ক) বাংলায় বৌদ্ধধর্ম

বাঙালির ইতিহাসের প্রাচীন পর্বে সমন্বয়ের সাক্ষ্য কমই আছে। সেখানে অনেকজন ও কৌমের অর্থাৎ আদিবাসীর পূজা, আচার, অনুষ্ঠান, ভয়, বিশ্বাস, সংস্কারের ইতিহাস পাই। জন্ম-মৃত্যুর বিশ্বাস, দেব-দেবী রূপকল্পনা আচার অনুষ্ঠানে আদিবাসীদের ধ্যান ধারণাগুলি আমরা গ্রহণ করছি।

বৌদ্ধ জনশ্রুতি যদি মেনে নিই তবে জৈনর্দে আজীবকদের কালেই বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন বাংলায় বিস্তার লাভ করেছিল। সম্রাট অশোকের আগে বৌদ্ধধর্ম বাংলার কোন কোন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। অশোকের সময়ে তা বাঙালির মন জয় করেছিল নিশ্চয়ই। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পুন্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভিক্ষুরা (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) রাষ্ট্রের সাহায্য লাভ করতেন।

প্রাক্-গুপ্তপর্বে বৌদ্ধদের প্রভাবের প্রমাণ পেলেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের কোনো চিহ্ন মেলে না। বেদ সংহিতায় বাংলার কোনো উল্লেখ নেই, ঐতরেয় আরণ্যকে নিন্দা করা হয়েছে।

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে বৌদ্ধ প্রভাব বেশি হয়েছিল। বৌদ্ধ শ্রমণেরা বাংলাদেশে বিশেষত উত্তরবঙ্গে যাতায়াত করতেন। মহারাজ শ্রীগুপ্ত স্তূপ স্থাপন করেন উত্তরবঙ্গের কোনো স্থানে। ফা হিয়েন তাম্রলিপ্তি বন্দরে বৌদ্ধ সূত্র ও প্রতিমা চিত্রের নকলনবিশী করেছেন দু বছর। তার সময়ে যেখানে বত্রিশটি বৌদ্ধ বিহার ছিল।

চীনা শ্রমণদের সৌজন্যে সপ্তম শতকে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পেয়েছি। য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণী এর মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ। পুন্ড্রবর্ধনে ছিল দশটি বিহার, তিন হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু সেখানে বসবাস করতেন। সবচেয়ে বড়ো বিহারে সাতশ মহাযানী ভিক্ষু বাস করতেন। তাম্রলিপ্তে দশের বেশি বিহারে এক হাজারের বেশি অধিবাসী ছিলেন। এ সময়ে বেশির ভাগ বাঙালি শ্রমণ ছিল হীনযানপন্থার। এক-চতুর্থাংশ ছিলেন মহাযানপন্থী, সর্বাস্তিবাদী, ধর্মগুপ্তবাদী, মহাসাংঘিকবাদী শ্রমণেরা হীনযানের বিনয়-শাসন মেনে চলতেন। তাম্রলিপ্তের জনৈক চীনা সন্ন্যাসী পরে চীনদেশে নিদানশাস্ত্রের ব্যাখ্যা প্রচার করেছিলেন। তিনি সংস্কৃত থেকে চীনা ভাষায় অনুবাদও করেন। কঠোর নিয়ম সংযম তারা মানতেন, সংসার থেকে দূরে থাকতেন, জীবহত্যার পাপ করতেন না। ভিক্ষুণীরা কখনই বাইরে একা যেতেন না।

বঙ্গ ও সমতটের খড়্গ রাজবংশের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ এবং তারা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সমতটের পরমবৈষ্ণব রাজা শ্রীধারণের সেনাপতি বৌদ্ধ জয়নাথ ব্রাহ্মণদের পঞ্চমহাযজ্ঞের জন্য জমি দান করেছিলেন। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম শতকে উল্লিখিত রাজবংশ ছাড়া বৌদ্ধধর্মের কোনো পৃষ্ঠপোষক ছিল না। বিহারের সংখ্যা কমে যাওয়ায় মনে হয় বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিপত্তি কম ছিল। য়ুয়ান চোয়াঙের সময়েই বৌদ্ধধর্ম তার সমৃদ্ধি হারিয়েছিল। হর্ষবর্ধনের সক্রিয় সহায়তা পেলেও বৌদ্ধধর্মের অবনতির

স্রোত আটকানো যায় নি। যদিও বঙ্গ, গৌড় এবং মগধে রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল হয়ে এই ধর্মকে আরো চার-পাঁচশ বছর টিকিয়ে দিল। ফলে মহাযান-যোগাচার-বজ্রযান বৌদ্ধ ধর্মের নতুন রূপ এল। এই নতুন বৌদ্ধধর্মের রূপারোপ একান্তভাবে বাঙালি মনীষার সৃষ্টি। বজ্রযান গুহ্য সাধনার সূক্ষ্ম স্তর হল সহজযান। এখানে দেবদেবীকে স্বীকার করা হয়নি, তেমনই মন্ত্র-মুদ্রা-পূজা-আচার-অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি নেই। এই সাধন পদ্ধতি দোহাকোষে ও চর্যানীতে ধারণ করা আছে।

সহজযানীদের মতে বোধি বা পরমজ্ঞান সাধারণ লোক কেন বুদ্ধদেবও জানতেন না। ঐতিহাসিক বা লৌকিক বুদ্ধের স্থান কোথায়? সকলেই বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারেন এবং দেহই বুদ্ধত্বের অধিষ্ঠান। শূন্যতাবাদ, বিজ্ঞানবাদ দূরে সরে গেল। এল শুধু দেহবাদ, কায়াসাধন। শূন্যতা হল প্রকৃতি, করুণা হল পুরুষ; এদের মিলনে বোধিচিত্তের পরমানন্দ আসে সেটাই মহাসুখ। এখানে ইন্দ্রিয়বোধের বিলুপ্তি ঘটে, সংসারজ্ঞান থাকে না, আত্মপর বোধ থাকে না, সংস্কার লোপ পায়।

ধীরে ধীরে গোপন বা গুহ্য সাধনা প্রবল হতে থাকে। বৌদ্ধ মহাসুখবাদ সঙ্গে তান্ত্রিক মোক্ষ সাধনপন্থার কোনো ফারাক রইল না বলে একে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বলেও অনেকে অভিহিত করেন।

(খ) বাংলায় জৈনধর্ম

বাংলার সবচেয়ে পুরনো ধর্ম হল জৈনধর্ম। এটি গুপ্ত রাজত্বের আগে উত্তরবঙ্গে বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে প্রসারিত হয়েছিল। অথচ গুপ্ত পর্বে জৈনধর্মের উল্লেখ বা মূর্তির প্রমাণ মেলে নি। পঞ্চম শতকে পাহাড়পুরে একটি জৈনবিহার ছিল। বারাণসীর নির্গ্রন্থনাথ আচার্যের শিষ্য ও তাদের অনুসরণকারীরা বিহারের হলেও তারা এক ব্রাহ্মণ দম্পতির কাছ থেকে জমি লাভ করেছিলেন দৈনন্দিন পূজার ব্যয় নির্বাহের জন্য। মাত্র দেড়শ বছর পরে য়ুয়ান-চোয়াঙ জানাচ্ছেন যে বাংলার দিগম্বর জৈনদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। এটা কেন হল, তা বলা এখন কঠিন। বাংলায় একসময় আজীবকদের প্রতিপত্তি ছিল। তাদের সঙ্গে জৈন নির্গ্রন্থীদের আচরণের ফারাক ছিল না। বহু সময় এদের একের দায় অন্যের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। প্রাচীন বাংলায় আজীবকরা আলাদা অস্তিত্ব তৈরি না করায় নির্গ্রন্থীদের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে য়ুয়ান-চোয়াঙও ভুল করেছিলেন।

পাল ও সেনপর্বে জৈনদের কোনো লিপি বা গ্রন্থ দেখি না। কিন্তু প্রাচীন বাংলার অনেক জায়গায় জৈন মূর্তি পাওয়া গেছে। নির্গ্রন্থ জৈনরা এসব মূর্তি তৈরি করেছেন। পাল পর্বের শেষ দিকে বীরভূম, পুরুলিয়া অঞ্চলে নির্গ্রন্থ জৈনদের সমৃদ্ধি ঘটেছিল। দশম থেকে ত্রয়োদশ শতকের অনেক জৈন মূর্তি ও মন্দির পরে পাওয়া গেছে।

সুন্দরবন অঞ্চল থেকে দশ-বারোটি জৈন মূর্তি পাওয়া গেছে একালে। এই মূর্তিগুলি ঋষভনাথ, আদিনাথ, নেমিনাথ, শান্তিনাথ ও পার্শ্বনাথের (পরেশনাথ)। মূর্তিগুলি সবই দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের। একাদশ-দ্বাদশ শতকে গৌড়ে, বঙ্গে ও পশ্চিম রাঢ়ে এদের সংঘ অস্তিত্ব (institutional identity)

ছিল। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত মূর্তিটি মুণ্ডহীন, ভগ্নবাদ, একান্ত নগ্ন জৈন মূর্তিটি আদিতম জৈন প্রতিমা হিসাবে আমাদের কাছে এসেছে।

বহুকাল পরে জৈন ধর্ম ও আচার প্রতিপালন গড়ে উঠেছিল মুর্শিদাবাদের জগৎসিংহ পরিবারের এবং সহযোগী ব্যবসায়ীদের আনুকূল্যে। এই মুহূর্তে বাংলায় জৈন ব্যবসায়ীদের সংখ্যা প্রচুর বলে তাদের রীতিনীতি, মন্দির স্থাপন দেখতে পাই। জৈনধর্ম নিয়ে একটি পত্রিকাও নিয়মিত প্রকাশিত হয়। তবে এদের অনুরাগীদের মধ্যে বাঙালির সংখ্যা এখন বিশেষ নেই।

৭.৪ সারাংশ

বাংলায় প্রাচীন ও মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রচলন দেখা যায়। এই দুই সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পারস্পরিক সহানুভূতি ছিল না। বৌদ্ধদের মধ্যে অনেক উচ্চবংশজাত শিক্ষিত মানুষ থাকলেও হিন্দু তথা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সদ্ভাব ছিল না। কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধদের মধ্যে তেমন কোনো বিরোধ চোখে পড়ে না। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব (চৈতন্য) যুগে হিন্দুদের সঙ্গে সমন্বয়সাধনের চেষ্টা হয়েছে। পরবর্তী এককে সে বিষয় আলোচিত হবে।

একক ৮ ❑ বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম ও সমন্বয় চেতনা

গঠন

৮.১ উদ্দেশ্য

৮.২ প্রস্তাবনা

৮.৩ বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম ও সমন্বয় চেতনা

৮.৪ সারাংশ

৮.৫ অনুশীলনী

৮.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৮.১ উদ্দেশ্য

ধর্ম নিয়ে হানাহানি, মারামারি, বিদ্বেষ বর্তমান যুগে যেমন আছে, প্রাগাধুনিক যুগেও তেমনি ছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বা হিন্দুত্ববাদীদের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের বিদ্বেষের কথা সর্বজনবিদিত। তবুও এদের এই পরস্পর হানাহানির মধ্যেও ঐক্যের ভাবনা, সমন্বয়ের চেতনা, লক্ষ করা যায়। আমাদের শিক্ষার্থীদের কাছে সেই সমন্বয়ের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টাই এই এককের লক্ষ্য।

৮.২ প্রস্তাবনা

বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম সমগ্র ভারত ও বহির্ভারতে বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মের সূচনার আগে থেকেই বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি ধর্মের উপাসকদের পাওয়া যায়। বিষ্ণুর উপাসক বৈষ্ণব (বিষ্ণু + অন্)। আর বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ, তাই কৃষ্ণের উপাসকগণ বৈষ্ণব নামেই পরিচিত। সারা ভারতে বিষ্ণু তথা কৃষ্ণের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন প্রকার মূর্তি পাওয়া যায় যা থেকে বৈষ্ণবদের কথা জানা যায়। তবে সবই তখন সংগঠিতভাবে হয়নি।

গৌড়বঙ্গে ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। চৈতন্য নিজে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে পথে নামেন নি। কিন্তু তাঁর আচার-আচরণে, সংকীর্ণতার পরিবর্তে সর্বধর্মসমন্বয়ের ভাবটি ফুটে ওঠে এবং তাঁর অনুগামীরা আকৃষ্ট হন। প্রায় তিন শতকের বেশি সময় ধরে বৈষ্ণব আন্দোলন চলতে থাকে এবং গৌড়বঙ্গ উৎকল, সমগ্র পূর্বভারতে সেই আন্দোলনের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান আলোচনায় তারই পরিচয় পাওয়া যাবে।

৮.৩ বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম তথ্য সমন্বয় ভাবনা

(ক) বৈষ্ণব ধর্ম

বাংলায় পুরনো লিপিতে (ধর্মপালের খালিমপুর) নন্ন নারায়ণের (= নন্দ নারায়ণের) উল্লেখ আছে। ইনি নন্দদুলাল কৃষ্ণাবতার নারায়ণ। দণ্ডায়মান বিষ্ণুর পাশে লক্ষ্মী-সরস্বতী (শ্রী ও পুষ্টি) অধিষ্ঠান। তাদের পূজা একত্রেই হত। স্তম্ভশীর্ষ গরুড়-প্রতিমাও নানান জায়গা থেকে পাওয়া গেছে।

পাল-চন্দ্র-কম্বোজ পর্বের বাংলায় বৈষ্ণব পরিবারের মূর্তির সংখ্যা বেশি। এই বৈষ্ণব পরিবারের পরিচয় হল বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও সরস্বতী; কোথাও দেবী বসুমতী; নিচে বাহন গরুড়; দুই দ্বারপাল জয়-বিজয়; বিষ্ণু-কৃষ্ণের বারো অবতার এবং ব্রহ্মা।

বেশির ভাগ বিষ্ণু মূর্তিই স্থানক বা দণ্ডায়মান, আসন বা শয়ান মূর্তি কম। কখনও কখনও চতুর্মুখ বিষ্ণু মূর্তিও পাওয়া গেছে ব্রহ্মার আদলে। অবতার হিসেবে বিষ্ণু মূর্তি বরাহ, বামন, নৃসিংহ রূপে পাই।

সেন-বর্মণ পর্বের বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসকে দুদিকে সমৃদ্ধ করেছে। একদিকে বিষ্ণুর দশাবতার অন্যদিকে রাধাকৃষ্ণের রূপকল্পনা। এই রাধাকৃষ্ণের ধ্যানকল্পনা চৈতন্য পর্বের (ষোড়শ শতক) সৃষ্টি তা সপ্তদশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত সবচেয়ে পরাক্রমী ধর্মভাবনা। সেন পর্বে রাধা গোপিনীরূপে কল্পিতা—এখানে শাক্তধর্মের প্রভাব আছে। কৃষ্ণ বজ্রযানীর বোধিচিত্ত, সহজযানীর করুণা, কালচক্রযানীর কালচক্র আর রাধা হলেন শক্তিদেবী, বজ্রযানীর নৈরাত্মা, সহজযানীর শূন্যতা, কালচক্রযানীর প্রজ্ঞা। এভাবে অতীত ও সমকাল বৈষ্ণব ধর্মকে স্পর্শ করেছিল। পরবর্তী সহজিয়া রাধাকৃষ্ণ পুরুষ প্রকৃতি ও শক্তি ধ্যান কল্পনার সঙ্গে একত্র হয়েছে এতে সন্দেহ নেই।

চৈতন্যযুগে বৈষ্ণব ধর্ম আমাদের উদ্দেশ্য হলেও তার প্রাক্‌পট না জানলে এমন মনে হতে পারে যে চৈতন্যের পূর্বে বৈষ্ণবধর্ম ছিল না। চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্মকে কালোপযোগী করে, শাস্ত্র থেকে এদের মানবীয় কল্পনা করে, বিভিন্নভাবে ভক্তি-প্রেম-কামের বৈলক্ষণ চিহ্নিত করলেন। তার চেয়ে বড়ো হল নিজের জীবনকে এই রাধাকৃষ্ণের অন্বয় বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তাত্ত্বিক ভাষ্য তিনি রচনা করেন নি। কিন্তু তার দিব্য জীবনকে মনে করা হয়েছে অন্তঃকৃষ্ণ বহিঃগৌর কিংবা 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।' সমস্ত মিলিয়ে বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব শুস্কতা কিংবা শাস্ত্রবিতর্ক সব কিছু একটা ক্রমে এসে পৌঁছেছে চৈতন্য জীবনে। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সূচনা করলেন, সমকালে ও উত্তরকালে বৈষ্ণব মঠ প্রতিষ্ঠিত হল। প্রথম শ্রেণীর কবিরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের রসপর্যায় নিয়ে অসামান্য কবিতা লিখলেন যা শতাব্দী পার করে এখনও প্রতিক্রিয়া জানায়। বৈষ্ণবতত্ত্ব ভাষ্য লিখলেন ষড় গোস্বামী। প্রথম মানুষের জীবনী সাহিত্যে এল চৈতন্য জীবনীর রূপ ধরে। এভাবে একজন মানুষ মহামানব হয়ে উঠলেন তার পূত বা চিত্রজীবন রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে বাংলায় প্রত্যক্ষ করাল। কীর্তন গান এল যা আসলে জাতপাত ভেদহীন সম্মেলন সংগীত। বৈষ্ণব মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হল

পরবর্তী পর্যায়ে। সব মিলিয়ে প্রায় দেড়শো বছর ধরে চৈতন্যপ্রভাব বৈষ্ণব ধর্মের একটা জনপ্রিয় রূপ বাঙালির সামনে হাজির করল।

চৈতন্যদেবের লালিত রাধাকৃষ্ণ ভক্তিলীলার 'জনতারে দিই কোল' অনেকদিন স্থায়ী হয়নি। কেন না বৈষ্ণব মঠ মন্দিরে এক সময় নারীরা আশ্রয় পেলেন। সপ্তদশ শতকের শেষদিকে দেখি যে ঐগুলি নৈতিক অধঃপতন, যৌন দুর্নীতির আখড়া হয়ে উঠল। বৈষ্ণবদের নেড়ানেড়ি বলে বিদ্রুপ করা শুরু হল। রাধাকৃষ্ণ প্রেমধারা বাঙালির জীবন থেকে অন্তর্হিত না হলেও এক শুকনো আচার অনুষ্ঠান নিত্যকৃত্যে পরিণত হল। যদিও চৈতন্য ও নিত্যানন্দের অসামান্য প্রয়াসে বাংলা উড়িষ্যা এবং বৃন্দাবনে বৈষ্ণব ভক্তের সংখ্যা যেভাবে বেড়েছিল, সেভাবে অনুরাগী পরিবারের সংখ্যা এখনও অগণিত।

যদিও বৈষ্ণব পরিচয় দেওয়াটা একালে একটু আড়ালে চলে গেছে। তবু রাধাকৃষ্ণ মন্দির ভজনা নামগান কীর্তন এখনও বাঙালির গ্রামীণ জীবনের সম্পদের মতো, ঐতিহ্যের মতো। কালের কঠিন স্পর্শে বৈষ্ণবতা হয়তো আমরা পালন করি না। কিন্তু প্রেমের, অসাম্প্রদায়িক চেতনার যে বীজমন্ত্র চৈতন্য আমাদের উপহার দিয়েছিলেন, তা প্রকট না হলেও সযত্নে লালিত অন্তরচারী ফল্গুস্রোতে প্রবাহিত হচ্ছে।

(খ) সমন্বয় চেতনা

সমন্বয়ের কথা বলতে গিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কথাকেও ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিতে মনে রাখতে হবে। সহজযানী সরহপাদ চর্যাগীতিতে অন্য সব ধর্মকে আক্রমণ করেছেন, বর্ণাশ্রমকে আক্রমণ করেছেন, বর্ণাশ্রমকে অস্বীকার, বেদ ব্রাহ্মণকে ধিক্কার জানিয়েছেন, যাগযজ্ঞের নিন্দা করেছেন, কঠোর সাধনার সন্ন্যাসকে প্রত্যাঘাত করেছেন। তিনি বলেছেন জৈনদের মতো উলঙ্গ (দিগম্বর) থাকলে যদি মুক্তি আসে তাহলে শেয়াল কুকুর আগে মুক্তি পাবে। বল্লাল সেন নাস্তিকদের পদচ্ছেদ করতেন। বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে বিদ্রুপ করতেন। আবার চৈতন্য ভাগবতে দেখি বৌদ্ধদের প্রতি বৃন্দাবনদাস কটূক্তি করেছেন।

এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের দৃশ্য বজ্রযানী দেবদেবী কল্পনাতেও আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইন্দ্রকে বলা হয়েছে মার (অশুভ, হত্যা)। শিবকে দশভুজামারীচীর পায়ে পিষ্ট দেখানো হয়েছে। ত্রৈলোক্যবিজয় শিবগৌরীকে পায়ে মাড়াচ্ছেন। ইন্দ্র অপরাজিতার ছাতা ধরে আছেন। ইন্দ্রাণী পরমেশ্বরের কাছে অপদস্থ হচ্ছেন। গণেশ তিনজনের দ্বারা পদপিষ্ট। অবলোকিতেশ্বর বিষ্ণুর কাঁধে উঠে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরাজয় ঘোষণা করছেন। এতটা নির্মিত ভাব বাঙালি ভাস্কর্যে করে নি। রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আছে। এখানে গণেশ কাজী, ব্রহ্মা মহম্মদ, বিষ্ণু পয়গম্বর, শিব আদম, নারদ শেখ এবং ইন্দ্র মৌলানা। ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে এখানে পর্যুদস্ত করা হয়েছে।

কিন্তু এই ধর্মসংঘাত একান্ত বাইরের বস্তু (outward manifestation) মিলন-সমন্বয়ের কথা হল বাঙালির মনের কথা। মানবতার যে কথা চর্যা থেকে চৈতন্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, তাকে মুছে ফেলা

যায় না। পরমতসহিষ্ণুতা যেমন বাঙালির গুণ ও দুর্বলতা, তেমনি বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে একটা ঐক্যসন্ধান বা সমজাতীয় (homogeneous) করে তোলা তার বহুদিনের পুরনো অভ্যাস। খড়্গ, পাল ও চন্দ্র বংশের রাজারা এই মিলনযজ্ঞে উৎসাহী ছিলেন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ দেবদেবীর রূপকল্পনায় তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল। বৌদ্ধ দেবালয়ে যেমন ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী স্থান পেতে শুরু করলেন, তেমনি ব্রাহ্মণ্য সীমানায় বৌদ্ধ দেবদেবীরা প্রবেশ করলেন। বৌদ্ধ সরস্বতী, বিঘ্ন নাটক ব্রাহ্মণ্য বিশ্বাস থেকে নেওয়া। চর্চিকা ও মহাকাল রূপে তারা বৌদ্ধধর্মে স্থান পেয়েছেন। যোগাসন এবং লোকেশ্বর বিষ্ণু, ধ্যানী শিব বুদ্ধের ধ্যান মূর্তি থেকে নেওয়া। বিষ্ণু ও শিবমূর্তির ওপরে খোদাই করা দেবমূর্তি তো ধ্যানী বুদ্ধেরই রূপভেদ!

বৌদ্ধ তারা দেবী, কালী, দুর্গা, উমা, পদ্মাবতী, বেদমাতা সকলে একই দেবীর ভিন্ন রূপ। লোকায়ত স্তরে এদের আলাদা মনে করা হত না।

অথচ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সাঙ্গীকরণের (assimilation) মাত্রা বৌদ্ধধর্মের চেয়ে বেশি ছিল। নালন্দার বৌদ্ধ বিহারে শিব পার্বতী গণেশ মনসারা পুজো পেতেন। এখানে বৌদ্ধধর্মের উদারতা সক্রিয় ছিল। অথচ বৌদ্ধ সংসারী মানুষের কাছে ব্রাহ্মণ্য মত কেন জানি না ক্রমেই গ্রাহ্য হচ্ছিল। পাল আমলের শেষ দিকে উচ্চ এবং মধ্য বাঙালির স্তরে বৌদ্ধ প্রভাব কমে আসছিল।

আসলে সিদ্ধাচার্যরা তাদের সাধনাকে গোপন থেকে গোপনতম করায় সাধারণ মানুষ যারা বৌদ্ধ মতের অনুরাগী ছিল, তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সেন আমলে রাজারা হিন্দু আদর্শে অনুপ্রাণিত বলে বৌদ্ধদের প্রতি বিরাগ পোষণ করতেন। আবার প্রতিমা আরাধনার দিক থেকে (idol worship) ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মের ব্যবধান করতে শুরু করল।

তত্ত্বের দিক থেকেও বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সাধনা কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। যেমন আজও শিবলিঙ্গের মাটির প্রতিমার ওপর একটি মাটির গুলি দেওয়া হয়, তার নাম বজ্র। বেলপাতা দিয়ে তাকে সরিয়ে তবে ঐ মূর্তি শিবপূজার যোগ্য হয়। এখানে সংঘাতের চিহ্ন আছে, আবার সামান্যের (proximity) বিন্দু আছে।

বুদ্ধকে বিষ্ণুর দশাবতারের অংশ করে নেওয়া হল। ব্রাহ্মণ কবি মাঘ 'শিশুপালবধ' কাব্যে বুদ্ধের প্রতি অনুরাগ দেখিয়েছেন। পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসারে বুদ্ধাবতারকে বেদবিরোধী বলে প্রণতি জানানো হয়েছে। জয়দেবের গীত গোবিন্দের দশাবতার স্তোত্রে বুদ্ধের যজ্ঞে পশুবধ-বিধির প্রবর্তক দেবসমূহের নিন্দার উল্লেখ করা হয়েছে—''নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং...''।

এভাবে বেদবিরোধী বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে গেলেন তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম ও তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য একাকার হল। বিহারগুলিতে কিংবা সংঘারামে সন্ন্যাসী গোষ্ঠীর ধর্মচেতনা সতেজ থাকলেও সেন-বর্মণ আমলে তার মধ্যে একটা নিশ্চেষ্টতা ঢুকে গেল। একসময় নালন্দা-বিক্রমশীলা-ওদন্তপুরীর মহাবিহার তুর্কী আক্রমণে ভেঙে পড়ল, হাজার পুঁথি নষ্ট হল, শতেক শ্রমণ প্রাণ হারাল। যারা বেঁচে

থাকলেন তাঁরা বহু কষ্টে কিছু পুঁথি সংগ্রহ করে তিব্বতে-নেপালে-কামরূপে আশ্রয় নিলেন। সেই অবলুপ্তির থেকে বেঁচে যাওয়া বইয়ের কিছু অংশ উনিশ বিশ শতকে আমাদের হাতে পৌঁছেছে। এই ধ্বংসলীলা এবং তার থেকে জ্ঞানকুম্ভ রক্ষা আমাদের অজ্ঞাত নয়। সেন রাজবংশের শেষ রাজারা যখন পূর্ববঙ্গে ছিলেন, তখন বৌদ্ধধর্ম একদম নিশ্চিহ্ন হয়নি।

আবার যখন সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন দেখি সুফী ধর্মকে মেনেও কবি আলাওল পদ্মাবতী রচনা করেছেন হিন্দু জনশ্রুতি নিয়ে। মৈমনসিংহ গীতিকার মুসলিম-হিন্দুর প্রণয় নিষেধাজ্ঞা পায় নি। সত্যপীর, সত্যনারায়ণ, ওলাবিবি এসবের পুজো প্রমাণ করে ধর্মের সমন্বয় ক্ষমতাও একটা বিচার্য বিষয়। বাঙালির বিভিন্ন পূজাপার্বণে মুসলিমরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন মণ্ডপ নির্মাণ, পুজোর উপচার সংগ্রহ, দেবীমূর্তি রক্ষায়। দেবীর প্রসাদ গ্রহণেও তারা বীতরাগ নন। সব মিলে বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে সমন্বয় কামনার একটা জোরালো দিক আছে। সেটি সম্পর্কে আমরা মাঝে মাঝে সচকিত হলেও অনেক সময়ই সংকীর্ণ চেতনার দাসত্ব করে থাকি।

৮.৪ সারাংশ

বঙ্গদেশ নানান ধর্মভাবনায় পূর্ণ। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম, তাদের নানান শাখা-প্রশাখা। হিন্দুদের মধ্যেই অজস্র শাখা, তার উপর অনার্য ধর্মভাবনায় বাংলা বৈচিত্র্যময়। তাই নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক। হিন্দুদের নানা শাখায় পারস্পরিক দ্বন্দ্ব লক্ষণীয়। আবার হিন্দু-বৌদ্ধ, হিন্দু-ইসলাম সংঘাত যেমন বর্তমানে তেমনি প্রাচীনকালেও লক্ষণীয়।

এরই মাঝে সমন্বয়ের চেতনা বা সাধনা দেখা গেছে। বিশেষ করে চৈতন্যের আবির্ভাবের পর বৈষ্ণব ধর্ম বেশ প্রসার লাভ করে, যদিও বৈষ্ণবরা বহুযুগ ধরে ভারতে ধর্মাচরণ করে চলেছেন। চৈতন্যদেব নিজে ধর্ম প্রচারের জন্য পথে নামেন নি, তবে তাঁর আচার-আচরণে, তাঁর কৃষ্ণভক্তির গভীরতায় (তাঁর 'আপনি আচরি ধর্ম, অপরে শেখায়') যে আদর্শ ধরা পড়ে, তাই ভক্তরা গ্রহণ করেছেন। ক্ষুদ্র, হীন, নীচ, পরধর্মী হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ লুপ্ত করে তিনি মানবতাকেই চরম মর্যাদা দিয়েছেন। সেই ধারাতেই বাংলায় সমন্বয় চেতনা জেগে উঠেছিল বাঙালি সমাজে।

৮.৫ অনুশীলনী

বিস্তৃত বিশ্লেষণাত্মক উত্তরাভিত্তিক প্রশ্ন :

১। রাজনীতি ও রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। কৌম শাসনব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?

৩। মধ্যযুগের সূচনায় রাজনৈতিক প্রবাহের তথ্যনিষ্ঠ পরিচয় দিন।

৪। একশ বছরের কালসীমায় বাঙালির রাজনৈতিক কীভাবে পরিমাপ করা যাবে?

৫। ১৮৮০ দশকে মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক চেতনার স্বরূপ কী?

৬। দুটি মহাযুদ্ধের অভিঘাত কীভাবে বাঙালি জীবনে পড়েছিল?

৭। সুভাষচন্দ্র কিভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন?

৮। বাংলায় বৌদ্ধধর্ম বিকাশ ও সূচনা প্রাচীনকালে কীভাবে হয়েছিল, তার বিবরণ দিন?

৯। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ১৯৪৬-এর ঘটনায় প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল?

১০। বৈষ্ণব ধর্ম কীভাবে বাঙালি মনে স্থান করেছিল, তার বিবর্তনধারা বুঝিয়ে দিন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। বাঙালি মধ্যবিত্তের অভ্যুদয় কবে তা জানান।

২। ১৯০৫-এ বাঙালি জীবনে কি ঘটেছিল?

৩। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আলোচনা করুন।

৪। চরমপন্থী নেতারা জাতীয় আন্দোলনে কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন?

৫। আধুনিক বাংলার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অবস্থান সংক্ষেপে লিখুন।

৬। জৈনধর্মের সম্পর্কে কি জানতে পারা যায়?

৭। বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মিলমিশ কিভাবে দেখানো হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৮। বৈষ্ণব ধর্মের প্রবক্তা চৈতন্য কি কি পরিবর্তন এনেছিলেন?

৯। সংঘাত ও সমন্বয় কামনা ধর্মের অপরিহার্য পরিণাম, তা জানান।

১০। ধর্মের সমন্বয়ী চেতনার একটি উদাহরণ দিন।

৮.৬ গ্রন্থপঞ্জি

নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব (দেজ সংস্করণ) থেকে তথ্যস্রোত সংগৃহীত।

মডিউল : ৩

চৈতন্যদেব ও বাংলার সংস্কৃতি ও অষ্টাদশ শতকে বাংলার সংস্কৃতি

একক ৯ ❑ চৈতন্যদেব ও বাংলার সংস্কৃতি-১

গঠন

৯.১ উদ্দেশ্য
৯.২ প্রস্তাবনা
৯.৩ চৈতন্যদেব ও বাংলার সংস্কৃতি-প্রথম পর্যায়
৯.৪ চৈতন্য সমকালীন ভক্তি আন্দোলন ও চৈতন্যপ্রেক্ষিত
৯.৫ সারাংশ

৯.১ উদ্দেশ্য

চৈতন্যদেব বাংলার জনমানসে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন দীর্ঘ দু'তিন শতক। প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে তাঁকে ঘিরে বাঙালির জীবন বিবর্তিত হয়েছিল দীর্ঘদিন। সেই চৈতন্যদেব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করানোই এই এককের উদ্দেশ্য।

৯.২ প্রস্তাবনা

চৈতন্য একজন ব্যক্তি, রাধাকৃষ্ণে নিবেদিত প্রাণ, পরমভক্তই নন, তাঁকে বাংলা সংস্কৃতির একটা মোড় ফেরানো ব্যক্তিত্বরূপে (epach making) কল্পনা করা উচিত। ব্যক্তি জীবনে যেমন অসংখ্য মানুষের শ্রদ্ধা, ভালবাসা অর্জন করেছিলেন, তেমন বৈষ্ণব ধর্ম-সাহিত্য-সংস্কৃতি তথা বাঙালির জনমানসে শতকব্যাপী প্রভাব ফেলেছিলেন। অনেকে তাঁর সমকালকে 'চৈতন্য যুগ' নামে চিহ্নিত করতে চান। বাংলায় ব্যক্তি নামে যুগের নামকরণ দেখি না। আসলে তাঁর ভক্তিস্নাত প্রেমমূর্তির পাশে সমাজ ভাবনা সমকালীন বাঙালি চেতনাকে কম আলোড়িত করে নি। প্রায় পাঁচশ বছর পরে তিনি আলোচনার বিষয়, বিতর্কের বিষয় এমনকি গবেষণার বিষয় হয়ে রয়েছেন। মধ্যযুগের ভারতীয় মনীষা এবং মানবপ্রেমী শ্রেষ্ঠ পুরুষদের মধ্যে তিনি গণ্য হয়েছেন। বাংলায় তাকে নিয়ে সমকাল উত্তরকালে অজস্র কবিতা রচনা করা হয়েছে, তাঁর জীবনী লেখার প্রসঙ্গ হয়ে জীবনী সাহিত্যের সূচনা করেছে, এমনকি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রাধাকৃষ্ণ লীলার পরিশ্রুতির ভূমিকা নিয়েছে, যা ঈশ্বরের প্রেমলীলাকে সঠিকভাবে গ্রহণের চাবিকাঠি বা কুঞ্চিকা। এর নাম গৌরচন্দ্রিকা।

একদিকে ঈশ্বরপ্রেমে মগ্ন, ভক্তি প্রচারে পরিব্রাজক 'কৃষ্ণনামে দিই কোল' মানবপ্রেমে মাতোয়ারা মানুষটির জীবন যতটা আকর্ষণীয়, ততটাই প্রভাব ফেলেছে বাঙালির মন-মনন-শিল্প-সাহিত্যচর্চায় এমনকি জীবনচর্যাতেও। সেই মহৎ জীবন এবং তার যুগান্তকারী সঞ্চরণশীল প্রভাব স্রোতমালা বাঙালির

অবশ্যপাঠ্য রূপেই এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে সংযোজিত হচ্ছে। ব্যক্তিজীবন কীভাবে সমষ্টিকে আন্দোলিত করতে পারে, তার একটা অনুভবী উপস্থাপনা আমাদের লক্ষ্য।

৯.৩ চৈতন্যদেব ও বাংলার সংস্কৃতি-প্রথম পর্যায়

১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি দোল পূর্ণিমায় চৈতন্যের জন্ম হয়েছিল। পিতা জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী। প্রথম সন্তানের জন্মের পর ছয়জন নবজাতকের মৃত্যুতে মিশ্র দম্পতি শোকগ্রস্ত হয়ে চৈতন্যের বাল্যকালে নাম দেওয়া হল নিমাই। আসল নাম ছিল বিশ্বম্ভর। আবার তাঁর গৌরবর্ণের জন্য প্রতিবেশীরা তাঁকে গোরা, গোরাচাঁদ, গৌরাঙ্গ বলে সম্বোধন করতেন। পনের-ষোল বছরে বিবাহ হল। পাত্রীর নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া। যৌবনেই তিনি পণ্ডিত বলে গণ্য হয়েছিলেন। শ্রীহট্টে পৈতৃক সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি যখন নবদ্বীপে নেই, তখন স্ত্রীর মৃত্যু হল। আবার বিবাহ হল, পত্নীর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। সংসার খুব সচ্ছল ছিল তাও নয়। টোলের ছাত্রসংখ্যা সামান্য। অন্নচিন্তা চমৎকারা হয়ে চৈতন্যকে কষ্ট দিলেও সবচেয়ে বড়ো যন্ত্রণা পেয়েছিলেন লক্ষ্মী দেবীর প্রয়াণে। মনের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক আকূতি জেগে উঠল। তার্কিক পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের সাধক হয়ে উঠলেন। ভক্তি গানের আসর, সঙ্গীর সংখ্যা বাড়ল। সুলতান হোসেন শাহের অনুগত নবদ্বীপের কাজী প্রথমে চৈতন্যের নগরকীর্তন ও পরিক্রমণ বন্ধ করলেও হোসেনের নির্দেশেই আবার সব কিছু আগের মত চলতে থাকল। চৈতন্যগোষ্ঠী থেকে সতর্ক হলেন হোসেন শাহ।

এই সঙ্কট মুহূর্তে চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ (১৫১০), ভক্তির ভাবস্রোত সহপাঠী ও বন্ধুদের ভক্ত হিসাবে আত্মপ্রকাশের মধ্যে ১৫১০ নাগাদ তিনি সংসার ত্যাগ করলেন, বাংলা ছেড়ে উড়িষ্যায় গিয়ে একই সঙ্গে সুলতানের রক্তচক্ষু এড়ালেন। সন্ন্যাসী হলেও নিজ বাসভূমে পরবাসী হওয়ার মধ্যে এক বাস্তব দূরদর্শিতা লুকিয়ে আছে।

উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র, সার্বভৌম এবং রাজগুরু কাশী মিত্রের আনুকূল্যে সেখানে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারপ্রবাহ বেড়ে চলল। দু'বছর ধরে দক্ষিণ ভারত পরিক্রমাকালে রায় রামানন্দ, পরমানন্দ পুরী তাঁর শিষ্যত্ব নিলেন। আলোয়ার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিত হলেন। ১৫১৪-তে একবার মাতৃদর্শনে এলেন। আবার কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন ভ্রমণকালে তপন মিশ্র, রূপ-সনাতন-বল্লভের (জীব গোস্বামীর পিতা) সান্নিধ্য পেলেন। ১৫৩৩-এর ২৯শে জুন পুরীতে তার মৃত্যুর আগে বারো বছর সেখানেই ছিলেন। ইতিমধ্যে গোঁড়া হিন্দুবাদী এবং জগন্নাথের পাণ্ডা সম্প্রদায় তার ধর্মজাতি নিরপেক্ষ মতামতের জন্য শত্রুতা করেন। চৈতন্যের ভক্তিরসের আধিক্য যেমন তাকে পরমভক্তের সম্মান দিয়েছে, তেমনি ভেদাভেদহীন এক সমাজচেতনাকে তিনি ভক্তির আড়ালে লালন করেছেন। বৈষ্ণব গোষ্ঠীর কাছে তাঁর অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর যেমন বন্দনীয়, তেমনি সামাজিক আন্দোলনে তিনি পথিকৃৎ অগ্রণী পুরুষ রূপেই চিরচর্চিত হবেন।

৯.৪ চৈতন্য সমকালীন ভক্তি আন্দোলন ও চৈতন্যপ্রেক্ষিত

চৈতন্য যে প্রেমধর্ম বাংলায় প্রচার ও সঞ্চার করেছিলেন, তখন বৈষ্ণব ধর্মমত ভারতবর্ষে নানা ধরনের আকার নিয়েছিল। চৈতন্যের নিজস্ব বৈষ্ণবশাস্ত্র রচনা না থাকলেও পরে তার প্রেরণায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম গড়ে উঠেছিল। ভারতে তখন বৈষ্ণবতা প্রচারিত ছিল—১. রামানুজের তত্ত্ব ২. মধবাচার্যের ভক্তিধর্ম ৩. বল্লভাচার্যের মত ৪. নিম্বার্কের ভক্তিবাদ ৫. রামানন্দ স্বামীর রামায়েৎ মতামত।

নিম্বার্ক ছাড়া বাকিরা ছিলেন দক্ষিণাবর্তের মানুষ। আসলে বৈষ্ণব ধর্ম দক্ষিণ ভারত থেকে পশ্চিম ভারত, সেখান থেকে উত্তরপ্রদেশ হয়ে বাংলায় প্রবেশ করেছিল। সুপ্রাচীন আলোয়ার মতে রাগানুগা ভক্তির সাধন ভজনে নিযুক্ত ছিলেন। ইসলামের একেশ্বরবাদ এবং নিষ্কাম ভক্তিসাধনা (সুফী) এদেশে হিন্দুসমাজে একটা মানসিক বিপ্লব ঘটিয়েছিল। রামানন্দ, নানক, কবীর, দাদূ ইত্যাদি সাধকেরা ইসলাম ও হিন্দুধর্মের সমন্বয়ের এক মধ্যমপন্থার অনুগামী ছিলেন। এরা জাতিভেদ মানতেন না। এদের ঈশ্বর ছিলেন শান্ত বা দাস্য রসের ভক্তির আকর। সমস্ত মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের ছায়া আছে, আচার অনুষ্ঠানের বাহ্যিক আচরণে নিষ্ফল, মানুষের কোনো পার্থক্য নেই, মূর্তিপূজা ব্যর্থ—এসবই এরা শিখিয়েছিলেন।

মাধবেন্দ্র পুরী বাৎসল্যরসের (ঈশ্বরকে সন্তানরূপে দেখা) সাধনা করতেন। অদ্বৈত আচার্য, ঈশ্বরপুরী, পরমানন্দ, শ্রীবাস এরা মাধবেন্দ্রের পথে বৈষ্ণবতার পূজারী ছিলেন। যবন হরিদাস প্রেমভক্তিতে মাতোয়ারা ছিল। এ ছিল প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্মের বীজবপনের ক্ষেত্র।

চৈতন্যের সমকালে লৌকিক, পৌরাণিক বৌদ্ধ দেবদেবীর অর্চনা হত। ধর্মরূপে বুদ্ধের পূজা, নানান তন্ত্রসাধনা, গুরুবাদ প্রচলিত ছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যও জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের স্পর্শধন্য হয়েছিল। চৈতন্য এই সাহিত্য ভক্তির অভিনব প্রকাশ খুঁজে পেলেন।

চৈতন্যের ভাবনা প্রচারের সঙ্গীদের উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। চৈতন্যের অনুসারীদের মধ্যে নৈয়ায়িক তত্ত্বজ্ঞানী বৈদান্তিক রূপ-সনাতনের মতো ইসলামি কেতাদুরস্ত উচ্চপদস্থ দরবারি মানুষ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবার অন্যদিকে প্রেমধর্ম প্রচারে অনুসঙ্গী ছিলেন বাংলা উৎকলের বিপুল জনগোষ্ঠী। একদিকে ক্ষুরধার তর্কজালে বিরোধীদের হারিয়েছেন অন্যদিকে ঈশ্বর ভক্তির শ্রেষ্ঠ স্তরের সাধনায় জগজনকে মোহিত করেছেন। আবার জাতিভেদহীন-ধর্মনিরপেক্ষ ভক্ত সমাবেশকে গৌড়ীয় ভক্তির আড়ালে সমাজের সংস্কার করতে চেয়েছিল। এই ত্রিধা সত্তার যেদিকই আমরা আলোচনা করি না কেন, তাতে বাঙালি মানসে নতুন ভাবমূর্তির প্রত্যাশিত আবির্ভাব ঘটেছিল।

৯.৫ সারাংশ

চৈতন্যজীবন বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃতিতে এক নবচেতনা এনেছিল। আমরা জানি মধ্যযুগের বহমান কাব্যধারা হল সমষ্টির প্রয়াস। সাহিত্য শিল্প এবং সংস্কৃতির কেন্দ্রে চৈতন্য-পূর্বকালে ছিল সমাজ,

গোষ্ঠীচেতনা, কৌম যোগাযোগ। মধ্যযুগের কাব্যপ্রবাহকে যদি কেউ বলেন সামাজিক মানুষের জীবন উন্মোচনের (manifestation of life) কাব্যিক প্রয়াস, তাহলে চৈতন্য সেখানে সমাজের বদলে সাহিত্য সংস্কৃতির ভরকেন্দ্র (epicentre) রূপে পরিগণিত হলো। একশ বছর ধরে ব্যক্তি চৈতন্য তার জীবনযাপন এবং কর্মাকর্ম সামাজিক সাহিত্যকে (social literature) ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় (individuality) অধিষ্ঠিত করল।

তাঁর জীবনের প্রতিটি পর্যায় স্তরবিভাগ করে সরাসরি কাব্যরূপ পেল। সেখানে অনেক সময় তিনি কৃষ্ণ-রাধা জীবনের প্রতি তুলনায় উপস্থাপিত। এই জীবন সাধারণ মানুষের হলেও তাতে অসাধারণতা সঞ্চারিত হল। ব্যক্তিজীবন সাহিত্যের একটা মোড় ফেরাল। বিষয়ভোগী স্থূল মানুষ যাতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবৈধতার চোখে না দেখে, কাম ও প্রেমের সূক্ষ্ম পার্থক্য পদাবলী এবং বৈষ্ণবশাস্ত্রে নবায়িত (renewed) হল। লেখা হল গৌরচন্দ্রিকা এবং গৌরপদাবলী। প্রথমটি রাধাকৃষ্ণ লীলার ঐশ্বরিকতা (divinity) উপলব্ধি করার জন্য, মনকে পবিত্র ও পরিষ্কৃত আর জন্য ব্যক্তি ভক্তের জীবন আখ্যানের ব্যবহার।

একক ১০ ❑ চৈতন্যদেব ও বাংলার সংস্কৃতি-২

গঠন

১০.১ উদ্দেশ্য

১০.২ প্রস্তাবনা

১০.৩ চৈতন্যদেব ও বাংলার সংস্কৃতি-দ্বিতীয় পর্যায়

১০.৪ বৈষ্ণবমতের স্বরূপ ও প্রভাব

১০.৫ চৈতন্যের উত্তরাধিকার পর্ব

১০.১ উদ্দেশ্য

পূর্ববর্তী এককে চৈতন্য মহাপ্রভু ও বাংলার সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনার প্রথম পর্বে চৈতন্যের জীবনালেখ্য ও পটভূমির বর্ণনা করা হয়েছে। এবারে চৈতন্যকেন্দ্রী সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় বিবৃত করা হবে।

১০.২ প্রস্তাবনা

চৈতন্যদেবের সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপট, জীবনালেখ্য পূর্ববর্তী এককে আলোচিত হয়েছে। এবার 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত তনু' গৌরাঙ্গের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে যে আলোড়ন ঘটেছিল সে বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হবে। চৈতন্যের অনুসরণে বাঙালির মধ্যে বিষ্ণু তথা কৃষ্ণের নাম নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়। কৃষ্ণনাম স্মরণ করার, কৃষ্ণকে অবলম্বন করার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। তাই বৈষ্ণবদের মধ্যে কৃষ্ণনাম শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ও বন্দন এই চারটি উপায়ে তাঁর ভজনা করার চেষ্টা দেখা যায়। আর সে জন্যে গান বা পদরচনার প্রয়োজন হয়। তাই কৃষ্ণের লীলা নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের পদ বা গান রচনার উৎসাহ দেখা দিল। বৈষ্ণবদের মধ্যে শুধু রাধাকৃষ্ণ লীলা নয়, গৌরাঙ্গকে নিয়েও পদরচনা শুরু হল। শুরু হল গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনা। আর পালা-গানের শুরুতে গাইবার জন্য পালা-অনুযায়ী 'গৌরচন্দ্রিকা' পদ রচনা হল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল 'চরিতসাহিত্য' রচনার সূত্রপাত। কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে অর্থাৎ চৈতন্যের জীবন অবলম্বন করে চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি জীবনী সাহিত্য রচনা হল। সমগ্র বঙ্গদেশ ও বহির্বঙ্গে বৈষ্ণবদের মহোৎসব শুরু হল—সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, সামাজিক সাম্য নিয়ে। বৈষ্ণব পদাবলী গানের জন্য চারটি ঘরানার সৃষ্টি হল। বর্তমান আলোচনায় সে-সবের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

১০.৩ চৈতন্যদেব ও বাংলার সংস্কৃতি-দ্বিতীয় পর্যায়

গাইবার জন্য পদরচনা, বিভিন্ন পর্যায়গান লেখার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি বৈষ্ণবদের মধ্যে আরেকটি নতুন ভাবনা হল, তা হল চৈতন্যের জীবনচরিত রচনা। মানুষের জীবন নিয়ে এই প্রথম লেখকেরা চরিত সাহিত্য রচনা করলেন। তার অনেকটা যেমন সাধুসন্ত মহাপুরুষদের অলৌকিক আখ্যান, বাকিটা বৈষ্ণব তত্ত্ব প্রবেশিকা (rudiments of Vaishanav Theology) এবং সাধারণ মানুষের অনুভবী (sensitive) জীবনমালা। এখানে পুরাণ, দর্শন, ভাগবত এমনকি বৈদিক সাহিত্যের সমর্থন বারবার নেওয়া হয়েছে। সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিতের জন্য সংস্কৃত শ্লোক যুক্ত হয়েছে। কখনও আবার পাঠক বা শ্রোতাকে আকৃষ্ট করার জন্য তত্ত্বের নীরসতাকে ছাপিয়ে সংলাপ, প্রবাদ, বিশিষ্টাতিক বাক্যাংশ, নাটকীয়তা এসেছে। চৈতন্যের কয়েকটি বাংলা জীবনী ভক্তের, তত্ত্বজ্ঞের অবশ্য পাঠ্য হয়ে উঠেছে—যেমন বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল। কোথাও আছে জীবনকে তত্ত্বের আলোয় দেখা, কোথাও আছে ব্যক্তি জীবনের উচ্চাবচতার হৃদয়গ্রাহিতা, কোথাও ইতিহাসের নামে গালগল্পের জনপ্রসিদ্ধির ব্যাপকতা। সবসময় যে চৈতন্যজীবন প্রথম থেকে শেষ অবধি একমুখীন হয়েছে, তাও নয়। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যের জীবনের একাংশ লিখেছেন। কৃষ্ণদাস চৈতন্যজীবনকে রাধাকৃষ্ণের ঐশ্বরিক প্রেমের অচিন্ত্যপূর্ব প্রকাশ বলে দেখেছেন। অনেকে চৈতন্যমৃত্যু নিয়ে ভাবিত হয়ে আঘাতজনিত রোগভোগ দেখিয়ে একটা সমাপ্তি টেনেছেন। অর্থাৎ চরিতগুলিও একটি বিশেষ ধাঁচে লেখা নয়। সেখানে ব্যক্তিমানুষের প্রতি যেমন আগ্রহ আছে, তেমনি জীবন থেকে তত্ত্বে পৌঁছনোর একটা আকৃতি আছে।

যা হোক এভাবে আমরা একই সঙ্গে সন্তজীবনী (hagiography) এবং জীবনীসাহিত্য (biography) পেলাম। এগুলি আলাদা বইয়ের স্বাদ জাগায় না। এদের একত্র পাঠ (collective reading) করা প্রয়োজন। হয়তো লেখকদেরও এরকম মানসিকতা ছিল। আবার এখানে একটা কালান্তর (time-gap) আছে। ফলে চৈতন্য জীবনী সাহিত্যকে একটা ক্যালিডোস্কোপের মতো, বর্ণালী স্রোতের নানান সংশ্লেষণ বিশ্লেষণের মতো দেখতে হবে। এদের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ তা না বিচার করে প্রত্যেকটি একে অন্যের পরিপূরক বলে ভাবতে হবে। তাহলে লেখকদের অভিপ্রায় (intention) স্পষ্ট হতে পারে।

কীর্তনগান বাংলায় ছিল না তার আগে এটা সত্যি নয়। বরং কীর্তনকে যদি সম্মেলক সংগীত (mass singing form) রূপে দেখি তাহলে সুবিধা হতে পারে। চৈতন্য এই গানে যেমন মানুষের মুখের মিছিল গড়েছিলেন, তেমনি ভক্তির জাতপাতহীন নবীন বৈষ্ণবতার (neo Vaishninsm) সঞ্চারিত করেছিলেন। আবার চৈতন্যের চলে যাওয়ার বহু পরে খেতুড়িতে যে বৈষ্ণব ধর্মসম্মেলন হল, সেখানে কীর্তন গানের পত্রপল্লব নতুনভাবে উদ্দীপিত হল।

একটি মানুষ যিনি জীবদ্দশায় মহামানব রূপে ('সচল জগন্নাথ') বন্দিত হয়েছেন, তিনি একাই জনমানস ও সংস্কৃতিকে একটা মোচড়ে (twist) যুগোত্তীর্ণ করে ফেললেন। ফলে চৈতন্য এখনও সমানে আলোচিত, তর্কের কেন্দ্র বিন্দু। দু'চোখে যদি ভক্তির ধারা বয়, তাহলে তিনি রাধাকৃষ্ণের অদ্বয়

রূপ, আর চোখে যদি যুক্তির আলো জ্বলে তাহলে তাকে বলতে হয় মানববাদী প্রতিবাদী এক প্রবল সত্তারূপে।

চৈতন্য ব্রহ্মবাদে আস্থা না রেখে ঈশ্বরকে ছটি ঐশ্বর্যের (ষড়ৈশ্বর্যময়) আকর মনে করেছেন। তিনি যেহেতু সচ্চিদানন্দ, তাই সংবিৎ, সন্ধিনী এবং হ্লাদিনী—এই তার ত্রিধা শক্তি।

আমাদের দেশে অসামান্য ভক্তকে অবতার বলে গণ্য করা হয়। চৈতন্য পার্ষদ (বয়ক্রম বেশি হলেও) নিত্যানন্দ হলেন বলরামের একালীক অবতার, অদ্বৈত আচার্য বিষ্ণু-মহাদেবের অবতার। চৈতন্যকে ভগবান বলে অনেক ভক্ত একত্র হলেও তার বিরোধী কম ছিল না। বাংলা তখন সুলতানদের অধিকারে। চৈতন্য যে বাংলা ছেড়ে সামান্য ভারত পরিক্রমা শেষে পুরীতে আশ্রয় নিলেন (যা আগে উল্লিখিত) বিরোধিতার প্রাবল্যের জন্য। উড়িষ্যা তখনও হিন্দুরাজ্য। জগন্নাথ দেবের মন্দির। বৈষ্ণবদের নানান মঠ ও আখড়া তাঁর পক্ষে নিরাপদ ছিল। আচার একই সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবদের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র থাকবে। এই রণকৌশল বৈষ্ণবতার জন্য তিনি নিয়েছিলেন। আবার আরেকটি চৈতন্যকৌশল হল অদ্বৈত-নিত্যানন্দকে বাংলায় প্রচারের জন্য রেখে যাওয়া। নিত্যানন্দ তাঁর কাছে থাকার বারবার অনুমতি চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হন। কেননা গুরু শিষ্য ঘনিষ্ঠতার চেয়ে বৈষ্ণব অঙ্গনে জনতার মেলা হবে এটাই চৈতন্য চাইতেন।

রায় রামানন্দ-চৈতন্যের সাক্ষাৎকার একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটাল। নবদ্বীপ লীলায় তিনি কৃষ্ণভাবে বিভোর হতেন—রামানন্দী রাগানুগা ভক্তি মার্গের সঙ্গে পরিচিত হলে তিনি রাধাভাবে দীক্ষিত হলেন। এভাবে চৈতন্যের সাধনার একটা পরিপূর্ণতা ঘটল। সারা উড়িষ্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম এভাবে সম্প্রসারিত হল।

সম্রাট সিকান্দার লোদীর নির্যাতনে মথুরায় তীর্থযাত্রা বন্ধ ছিল। বৃন্দাবন ধ্বংসোন্মুখ হয়েছিল। চৈতন্যদেব এই লুপ্ত তীর্থ (lost religious place) পুনরাবিষ্কারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ভূগর্ভ, লোকনাথ স্বামীকে, পরে রূপ-সনাতনকে পাঠান। এরা বৃন্দাবনকে বৈষ্ণবতীর্থে আবার রূপান্তরিত করলেন। বাংলার প্রেমধর্ম ও সংস্কৃতি এভাবে উত্তর ভারতে সম্প্রসারিত হল।

আসামে শঙ্করদেব ও মাধবদেব বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করলেন; মণিপুরে ধর্ম ও সংস্কৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দ্বারা প্রভাবিত। পূর্ব ভারতের বাকি জায়গাতেও চৈতন্য দ্বারা প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রসারিত হল। এক গরীব ব্রাহ্মণ সন্তান সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রণোদনা সৃষ্টি করেছিলেন।

গড়ে উঠল পদাবলী সাহিত্য। চৈতন্যলীলা ও রাধাকৃষ্ণলীলা এই দুভাগে বিভক্ত হলেও আসলে এগুলি পরস্পরের সম্পূরক (complementary)। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, নরহরি, নরোত্তম, লোচনদাস, বাসুদেব ঘোষ, বৃন্দাবন দাস, ঘনশ্যাম, জগদানন্দ, উদ্ধব দাস, যদুনন্দন, রায়শেখর, কবিরঞ্জন এরা বিচিত্র পদাবলী উপহার দিয়েছেন। সেই রসধারা এখনও বিলুপ্ত হয়নি।

চৈতন্য প্রভাবে এদেশে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য কমে। ব্রাহ্মণেরা শ্রদ্ধেয় ছিলেন, বৈষ্ণবরাও শ্রদ্ধেয় হলেন। বৈষ্ণবসেবা গৃহীদের মহৎ কর্ম বলে বিবেচিত হত। হরিভক্তিপরায়ণ শূদ্রকে ব্রাহ্মণেরা ভক্তি

করলেন। ক্রমে বৈষ্ণব ভক্তেরা গুরুর মর্যাদাও পেতে লাগলেন। উঁচুজাতের লোকেরা তাঁর কাছে দীক্ষা নিলেন। দেশে জাতপাতের তীব্রতা কমলো। অস্পৃশ্য নিম্নবর্ণের লোকও মানুষ বলে গণ্য হল। নগর সংকীর্তন এই কাজে সাহায্য করেছিল। চৈতন্যের শিক্ষাষ্টকের (eight commandments) একটি 'চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ'।...

অনেকে চৈতন্যের সত্তায় ভগবত্তা আরোপ করলেও মানবিকতা তাঁর জীবনে ওতপ্রোত হয়েছিল। প্রথমে জীবনে তার রহস্যপ্রিয়তা, তার্কিকতা এবং কলহপ্রিয়তা সহপাঠীরা উল্লেখ করেছেন। নিজে শ্রীহট্টের লোক হলেও তাদের ভাষা নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করতেন। দিগ্বিজয়কে হারানোর পর তার জীবনে অর্থ খ্যাতির বন্যা বয়েছিল।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি ঘুমে আচ্ছন্ন রেখে চলে গিয়েছিলেন, তা নয়। বরং নিজের চতুর্ভুজ-মূর্তি দেখানোর পর যখন স্ত্রীকে বোঝানো যায়নি, তখন তিনি 'কোলে করি করিলা প্রসাদ'। এই শেষ সাক্ষাৎকার। বিদায় অনিবার্য ধরে নিয়েছেন বিষ্ণুপ্রিয়া। আবার চৈতন্যের আদরের সুখস্মৃতি তার বহু সাধনার ধন হয়ে রইল।

চৈতন্যের মানবিকতার আরেকটি দিক হল স্বাভাবিক অবস্থায় (যখন তিনি ঈশ্বরোন্মাদ নন) কাউকে প্রণাম করতে না দেওয়া। অদ্বৈত একবার গুরুজন হয়েও প্রণাম করাতে তিনি নিজে তার চরণ নিজের মাথায় নিলেন। এখানে ঈশ্বরত্ব নয়, মানবিক আচরণই বড়ো।

চৈতন্যচরিত্রে যে দৃঢ়তা দেখি, তা মানসিকতারই নমুনা। গোবিন্দ ঘোষকে হরিতকি সঞ্চয়ের জন্য ভৎর্সনা ও পরিত্যাগ, কাজির বাড়িতে ভক্তসহ অভিযান, জগাই মাধাইয়ের চিত্ত পরিবর্তন, মাধবীর কাছে ভিক্ষান্ন নেওয়ার জন্য ছোট হরিদাসকে পরিত্যাগ, প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে সাক্ষাতে রাজি না হওয়া—তার মানবিক পরিচয়কে উদ্ঘাটিত করেছে। চৈতন্যের কাছ থেকে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি মানবিকতার মন্ত্রে দীক্ষা পেয়েছিল।

সমস্ত দেশে মহাপুরুষজীবনী লিখলে ভক্ত লেখক পাঠকদের জন্য কিছু অলৌকিক আখ্যান যোগ করেন। এদের মধ্যে ভক্তি আবার বিশ্বাসও ছিল। ফলে চৈতন্যচরিতে অলৌকিকতা কতটা কাব্যপ্রণোদিত, তা বিচার করা এতদিন পরে কঠিন। আমরা ভুলে যাই যে চৈতন্যচরিত কোনো ঐতিহাসিকের লেখা নয়, কবির রচনা। কাব্যে অনেকসময় বাস্তব জীবনেও অবাস্তবতা, মানুষ জীবন্ত দেবতায় পরিণত হয়। আমরা যদি একালে ভক্তিহীনতার ঊষর বালুভূমিতে এদের না মেনে নিই, তাহলে কী-ই বা করার আছে তাকে শুধু কাব্য অলংকার বলে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া। মনে পড়ে শেক্সপীয়রের সেই হ্যামলেটীয় উক্তি, 'There are more things, Horatio, than are reported in your papers.'

১০.৪ বৈষ্ণবমতের স্বরূপ ও প্রভাব

আমরা এর আগে একটা চৈতন্যসংস্কৃতির সার্বিক পরিচয় দিয়েছি। তবু ঐ সংস্কৃতির অনুদর্শন (microfindings or philosophy) বোঝার দরকার আছে। তাই এই আলোচনা শুরু করছি।

বৈষ্ণব মত মানুষের সংকীর্ণ মনোভাব ও নিষ্ঠুর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে অনেকটাই দূর করেছিল। ফলে বৈষ্ণবমতের উদারতা ও মানবিকতা দেবী সাহিত্য বা মঙ্গলকাব্যেও প্রসারিত হয়। মানুষের মধ্যে নারায়ণকে দেখা কিংবা জীবে ব্রহ্মের অনুভূতি; যুগের আদর্শ (ideal of the age) হয়েছিল। আজকে উনিশ শতককে বলি পুনরুজ্জীবনের (renaissance) যুগ। সেই পুনর্জীবন চৈতন্যোত্তর সময়েও ঘটেছিল। কিন্তু তা মধ্যযুগে বলে তাকে সমূহ শ্রদ্ধা করি না।

অসংখ্য কবি সৃজনশীলভাবে অজস্র রচনাস্রোতে বাংলা ষোড়শ শতককে মধ্যযুগের মধ্যমণি করে তুলেছিলেন। ভাব, ভাষা, রূপ, চিত্রল উপমায় এই শতকে সাহিত্য নবরূপ লাভ করেছিল।

এই বাঙালির পুনর্জীবন বা পুনর্জাগরণ চৈতন্যেরই দান। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে এসে অবৈষ্ণবেরা নিজেদের চৈতন্যবাদে সমর্পিত করল। যোগাচারী বৌদ্ধরা রাধাকৃষ্ণের লীলাবাদকে মেনে নিয়ে নতুন সহজিয়া বৈষ্ণবতা সৃষ্টি করল। শাক্ত সমাজেও দেবীর বাৎসল্য ও করুণাঘন রূপের প্রাধান্য দেখলাম। শৈবসম্প্রদায়ে উদাসীন শিবের জনপ্রিয়তা দেখা দিল এবং তন্ত্রাচারে কঠিনতা ছাড়িয়ে প্রেমরসের প্রভাব পড়ল।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, শ্রীধর যারা ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে কলম ধরেছিলেন, তাদের অধিকাংশই সুলতান বা সামন্তের অনুগ্রহ পেয়েছিলেন।

নতুন সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের দ্বিতীয় দিক হল বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সমাজে সংস্কার (reform) প্রয়াস চলল। হিন্দুদের মনে নবজীবনে জাগোর মন্ত্র উদ্ভাসিত হল।

তৃতীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হল উত্তর ভারতের সন্ত ধর্মের (saint religion) অনুসরণে সুফী প্রভাব, দক্ষিণ ভারতীয় অদ্বৈততত্ত্ব ও ভক্তিবাদের সূত্রে অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত্যবাদ ও প্রেমবাদ। চৈতন্যের ব্যক্তিমনীষার ফসল এই নবীন অধ্যাত্মবাদ (Neospiritualism) হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন নয়।

চৈতন্যের নেতৃত্বে যে আন্দোলন তৈরি হয়েছিল, তা স্মৃতি-শাস্ত্রের সীমানা ছাড়ানো। এছাড়া মানুষ দেখেছিল আজ যে ক্রীতদাস, কাল সে বাদশাহ। সামান্যের (general) অসামান্যে (special status) উত্তরণের এই চিত্র জনমনে একটা অন্য ধরনের ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার (stamp of individuality or rise of individual) সফলতার চিহ্ন ছড়িয়েছিল। মানুষের এই আত্মপ্রসারণ (expansion of self identity) তাঁকে সামাজিক বন্ধন মুক্ত করার জন্য প্রয়াসী করল। ব্রাহ্মণদের বাঁধন যতই শক্ত হল, তবু বিধির বিধান ছিঁড়বার আকুলতা গভীর হয়ে উঠল।

বৈষ্ণব সাধন পদ্ধতিতে ও সামাজিক আচারে ইসলামি রীতিনীতির অনুসরণ রয়েছে। এ কথা আমরা আগে ভাবি নি কারণ আমাদের ইতিহাস জ্ঞান ও সংস্কৃতির মিশ্রণবোধ প্রায় শূন্যাকার ধারণ করেছে। ফলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এগুলিকে স্বভাবত স্বতন্ত্র দেখানো হয়েছে, বিজাতীয় কোনো প্রভাব স্বীকার এখনও অবধি স্বীকার করার দুঃসাহস আমরা দেখাই নি বাঙালিসুলভ নম্র দৃঢ়তায়।

চৈতন্যের আগেই ভক্তিবাদ বাংলায় প্রচারিত ছিল। বাঙালিরা সকলেই বৈষ্ণব হয়ে গেলেন, এমন কথা বলি না। কিন্তু বাঙালি সুস্থতার একটা আস্বাদ পেল চৈতন্যদর্শনে। কিন্তু চিরদিন কবহু একহু ন জীবয়ে অর্থাৎ চিরকাল একই থাকে না।

১০.৫ চৈতন্যের উত্তরাধিকার পর্ব

সপ্তদশ শতক থেকে বৈষ্ণবীয় উদারতা সংকীর্ণতায় পরিণত হল। গোষ্ঠী বিভাজন দেখা দিল। সময়, শক্তি এবং মনন অপচিত (digressed) হল। এক আন্তঃ-সাম্প্রদায়িক বোধ এই আন্দোলনকে ক্ষয় করল (inter group rivalry)।

সপ্তদশ শতকে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসও দ্বন্দ্বময় ছিল। অন্যদিকে সাহিত্যে বৈষ্ণব প্রেমভাবনা, রসপর্যায়, কীর্তনগান, কাব্যপাঠ যে নবীনতার দ্যোতনা ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছিল, সেখানে অনুসরণ, অলঙ্কৃতির বিষয়তা (disproportionates rhetorical sense), ছন্দের চাকচিক্য এবং নিষ্প্রাণতা সাহিত্যকে বিবর্ণ করে দিল। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গানে, চণ্ডীদাসের কাব্যেও যৌনতা ছিল। কিন্তু এই সময় বিশেষ করে সপ্তদশের শেষের দিকে নিছক যৌনমিলন এবং তার উপযোগী ইতর ভাষার সংমিশ্রণ পদাবলীকে উত্তেজক রচনা (pornography) করে তুলল। ভাবমোক্ষণ (cathersis) তো দূরের কথা, সাধারণ মাধুর্য, প্রেমের অপার মহিমা, পবিত্রতা ধরার ধুলোয় হারিয়ে গেল। বৈষ্ণবের ভক্তিহীনতা, নিষ্ঠাহীনতা, তত্ত্বহীনতা প্রকট হয়ে উঠল।

মঠ-মন্দিরে বৈষ্ণবীদের থাকার অনুমতি দেওয়া হল। ফলে একটা বড়সড়ো বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলী। গড়ে না উঠে কামকলা বিলাসের আখড়ায় তা পর্যবসিত হল। গুরুবাদের নামে, সাধনার নামে নারীশোষণের এক কদর্য অধ্যায় দেখা দিল। বৌদ্ধ প্রভাবে মস্তক মুণ্ডিত বলে এদের অনেকে 'নেড়া-নেড়ী' বলে অভিহিত হতেন। এই বিশেষণে যতটা না শ্রদ্ধা আছে, তার চেয়ে বেশি আছে সামাজিক ভ্রূকুটি, বিদ্রূপ। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা তন্ত্রনির্ভর দেহসাধনার মতো এক উচ্ছৃঙ্খল ধর্মীয় আবহাওয়া তৈরি করছিল। আবার মঠ-মন্দিরের সম্পত্তি নিয়ে নানান সংঘাত গড়ে উঠেছিল। এমনকি বৈষ্ণব মঠাধ্যক্ষ কে হবেন, এ নিয়ে চরম প্রতিযোগিতা চলত। সাধিকারা ছিলেন মহান্তের লালসার সেবাদাসী। এভাবে ধর্ম ও প্রচারের আড়ালে বৈষ্ণবতার এক অধঃপতনের মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছিল। আসলে বাঙালি জীবনে যে নৈরাজ্য বিশৃঙ্খলা বহমান ছিল, তা বৈষ্ণব মানবধর্মকেও নারকীয় করে তুলেছিল। ব্যক্তিজীবনে লোভ, লালসা, টাকা জোগাড়, নব্য ধনী ও বানিয়াদের অত্যাচার গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এই সমাজের বাঁধন, ব্যক্তি জীবনের চর্যা শিথিল হওয়াতে বিগত শতকের প্রেমধর্ম সমালোচনার মুখে দাঁড়াল। ফলে শাক্ততন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ্যবাদ তাদের হারানো বৈভব ফিরে পাওয়ার জন্য লড়াই চালাল। বৈষ্ণবতা বিলুপ্ত হল না। কিন্তু উদার মানবতার যে পাঠ চৈতন্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করেছিলেন, তার চর্যা আচরণ বন্ধ হতে থাকল। বিস্ময়কর প্রেমধর্মের উত্থান ও বিস্তার, মর্মান্তিক তার ছিন্নভিন্ন হওয়ার সুর।

একক ১১ ❑ অষ্টাদশ শতকে বাংলার সংস্কৃতি-১

গঠন

১১.১ উদ্দেশ্য

১১.২ প্রস্তাবনা

১১.৩ অষ্টাদশ শতকে বাংলার সংস্কৃতি-প্রথম পর্যায়

১১.৪ সারাংশ

১১.১ উদ্দেশ্য

বৈষ্ণব-সংস্কৃতির পরবর্তী যুগে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিচয় দেওয়া এই এককের মূল উদ্দেশ্য।

১১.২ প্রস্তাবনা

চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিবাদে সমগ্র বঙ্গ তথা বহিঃবঙ্গ ভেসে গিয়েছিল আবেগে। আগের দুটি এককে সে বিষয় আলোচিত। সেই আন্দোলন গতানুগতিকতায় স্তিমিত হয়ে পড়ে, ভক্তিবাদ ভোগবাদে পরিণত হতে থাকে উপযুক্ত নায়কের অভাবে। এদিকে রাজনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতিও খারাপ হতে থাকে অষ্টাদশ শতকে। দিল্লির মোগল আধিপত্য ভাঙনের মুখে, যার প্রভাব বঙ্গদেশেও পড়ে। তার ওপর মারাঠা বর্গীর অত্যাচার লুণ্ঠন বঙ্গদেশকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। যদিও আলিবর্দী খাঁর চেষ্টায় বর্গীরা কিছুটা দমিত হয়েছিল। তারপর বাংলায় ইংরেজদের শাসনের সূচনা হয়। দেশের এই টালমাটাল অবস্থায় কবি সাহিত্যিকরা নীরব ছিলেন না। বাঙালির ধর্ম, সমাজ, শিল্পচর্চা বিপর্যস্ত হলেও, তার স্রোত স্তব্ধ হয়ে যায়নি। এই এককে অষ্টাদশ শতকের বাংলার সংস্কৃতির প্রথম পর্বের আলোচনায় তার পরিচয় উদ্ঘাটনের প্রয়াস।

১১.৩ অষ্টাদশ শতকে বাংলার সংস্কৃতি-প্রথম পর্যায়

অষ্টাদশ শতকের প্রেক্ষাপট : রাজনৈতিক ও সামাজিক

১৭০৭ সালে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হল। পরাক্রান্ত মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙনও শুরু হয়ে গেল। দিল্লির দরবারে তখন টাকার খেলা চলছে। মনসবদারি রাজ্য শাসনের দায়িত্ব ক্রমে নীলামে উঠল। যে বেশি টাকা নজরানা (প্রণামী, bribe) দেবে, সেই শাসন ক্ষমতা কিনতে পারবে। এভাবেই হায়দ্রাবাদী ব্রাহ্মণ সন্তান ক্রীতদাস থেকে সৈন্যদলে যোগ দিয়ে, ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে; মুর্শিদকুলি খান সম্রাটের

নজরে পড়লেন অস্ত্রদক্ষতায় এবং অর্থশক্তিতে। এভাবে সামরিক শক্তি ও আর্থিক শক্তিতে তিনি বাংলার নবাব হলেন। আশ্চর্য সুষ্ঠু শাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থায় বাংলাকে সুশাসিত করলেন।

দিল্লিতে তখন কেন্দ্রীয় শাসনের টলমল অবস্থা, বিলাসিতা-চারিত্রিক স্খলনের চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছেছেন মুঘল নায়কেরা। অনেকেই স্বাধীনভাবে রাজ্যগুলোয় শাসন চালাচ্ছেন। সম্রাটের কাছে 'অর্থচিন্তা চমৎকারা শাসন কাতরে কুৎ'। এক কথায় নৈরাজ্য চলছে। তার মধ্যে মুর্শিদকুলি নিজের বিচক্ষণতায় বাংলা সুবাকে সংগঠিত করেন। তারপর এলেন আলীবর্দী যিনি প্রত্যক্ষত মুর্শিদের বংশধর নন। এখানেও টাকার জোরে তিনি সুবাদার হয়েছিলেন। এ সময় মারাঠারা বর্গীর বেশে হাঙ্গামা শুরু করেছিল বাংলাতেও। আলীবর্দী তাও দমন করেন। রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে আসে। আলীবর্দীর পরিবারে নানান ষড়যন্ত্র চলেছিল উত্তরাধিকার নিয়ে। শেষাবধি তার নাতি সিরাজদ্দৌলা নবাব হন সামান্য সময়ের জন্য। আলীবর্দী-সিরাজ দুজনেই ইংরেজ বণিকের আগ্রাসনের বিরুদ্ধতা করেছিলেন।

ধনকুবের জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ এবং সেনাপতি মীরজাফরের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতায় ১৭৫৭-র ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ হারলেন রবার্ট ক্লাইভের কাছে। মীরজাফর, পরে তার জামাতা মীরকাশেম নবাব হলেন পুতুলের মতো। মীরকাশেম বিদ্রোহী হলে ইংরেজরা অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় পাদে ক্ষমতা সরাসরি হাতে নিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামে ব্রিটিশ রাজত্ব হল বাংলায়। অন্যান্য য়ুরোপীয় বণিকেরাও কলোনী গড়ে ব্যবসা ক্ষমতা দখল করতেন। যেমন চন্দননগরে ফরাসীরা বরাবরই উপনিবেশ বজায় রেখেছিল। শ্রীরামপুর, হুগলি-ব্যান্ডেল এসব জায়গায় দিনেমার (Danish) ও পোর্তুগীজদের কুঠি ও ব্যবসার মাধ্যমে য়ুরোপীয় বণিকের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় স্থাপিত হয়েছিল। অর্থনৈতিকভাবে জার্মান বণিকেরা কুঠি স্থাপন করেছিল। ফলে য়ুরোপীয় বাণিজ্যের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যের, মানুষের একটা মেলবন্ধন গড়ে উঠল। মুঘল বা ইসলামি সভ্যতাও বিদেশি। তবু তা অনেকদিন ধরে এ দেশে থাকায় একটা ভারতীয়ত্ব (Indianness) অর্জন করেছিল। য়ুরোপের সভ্যতার প্রসারণ ছিল বাণিজ্যিক, তা ধীরে ধীরে গ্রাস করে। পেছনে আসে সামরিক শক্তি। চলে শাসন ক্ষমতা দখলের চেষ্টা। ইংরেজ বণিকরা অন্য য়ুরোপীয় বণিকদের সরিয়ে দিয়ে মুখ্য ভূমিকা নিল।

১৭৫৭ থেকে ইংরেজ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে দাঁড়াল। মীরকাশেমের পর সরাসরি তারা শাসন শুরু করল বড়লাট (governor general) পদ সৃষ্টি করে। কোম্পানির শাসন এভাবে চলেছিল ১৮৫৭ সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত; কিন্তু এরপর রানি ভিক্টোরিয়া কোম্পানির বদলে ইংরেজ সাম্রাজ্যের পত্তন করেন।

অষ্টাদশ শতকের বাঙালির সংস্কৃতি বিচিত্রা

বাঙালি এই সময় প্রায় একশ বছর নানান বিচিত্র সংস্কৃতির প্রভাবে পড়েছিল। সবচেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছিল ইংরেজ সংস্কৃতি (English Culture)। মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত ত্রিধারা ক্রমে শুকিয়ে এসেছিল। কেননা দেবদ্বিজে ভক্তিশ্রদ্ধা কম ছিল। চারিদিকে অর্থনৈতিক শোষণ, অন্নের অকুলান, জীবনের অনিশ্চয়তা

বাঙালি মনকে ভারসাম্য হারাতে বাধ্য করেছিল। তাই মনসা, চণ্ডী, ধর্ম ইত্যাদিরা প্রায় বাদ পড়লেন। নতুন দৈবী হলেন অন্নের দেবী অন্নপূর্ণা বা অন্নদা। বাঙালি মনের একান্ত কামনা হয়ে উঠল 'দুমুঠো ভাত, একটু নুন।'

শিব পৌরাণিকতার আবডাল থেকে কৃষিদেবতা, মৎস্যজীবীর দেবতারূপে এলেন বাংলা সাহিত্যে। এতদিন পরে লেখা হল শিবায়ন। পাশাপাশি রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদধারা ক্ষীণস্রোতা হয়ে গেল। পদাবলীর সংকলন গ্রন্থ করা হলেও বড়ো কবির সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। দেবতার মাহাত্ম্যকীর্তন ক্রমে জনতার জীবনকীর্তনে পরিণত হল যার পরিণাম হল কবিগান, টপ্পা। জমিদার ও বড়লোকদের মধ্যে শহরকেন্দ্রিকতা দেখা দিল। তাদের উচ্ছৃঙ্খল, মদ্যপ, নারীবিলাসী জীবন সাধারণ মানুষের অধরা থাকলেও এই 'হঠাৎ নাবুবরা' সাংস্কৃতিক একটা নৈরাজ্য তৈরি করলেন (cultural anarchy)। লোকের রুচিজ্ঞান, নীতির ভারসাম্য, শান্ত সুস্থির জীবনযাপন বিঘ্নিত হল। ফলে সাহিত্য সংস্কৃতিতে এই নেই রাজ্যের ঢেউ আছড়ে পড়ল।

আঠারো শতকের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক রচনায় এক প্রাণহীনতা, অনুকরণপ্রবণতা, মলিনতা লক্ষ করি। সাধকের নিষ্ঠা সেখানে নেই শুধু কামকলাকুতূহল। এগুলি গাওয়া হত, কথকতা করা হত কিংবা কাহিনীরূপে বর্ণিত ও শ্রুত। এরই মধ্যে দীন ভবানন্দের সংস্কৃত 'হরিবংশ' সাহিত্যরূপে নজর কাড়ে। তিনি নিজেকে দীন ভবানন্দ বা ভবানন্দ দীন বলেছেন। ১৯৩২-এ সতীশ রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত। এখন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের তালিকাভুক্ত হয়েছে, এটিও আদিরসাত্মক সুখপাঠ্য। কৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলীর আদল এখানে দেখি। এটি প্রায় সপ্তদশ শতকের শেষদিকে (১৬৮৯) লিপ্যন্তরিত হয়েছিল বলে আমরা আমাদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করলাম।

দ্বিজ জগৎরাম—আঠারো শতকের শেষ প্রহরে পুত্রের সহযোগিতায় অদ্ভুত রামায়ণ রচনা করেছিলেন। নয় খণ্ডে বিভক্ত রামানন্দ ঘোষ বা বুদ্ধাবতার রামকথা, রামতত্ত্ব ও চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেছিলেন। নিরন্ন কবি ঈশ্বরে আস্থা হারিয়েছিলেন—

দন্তহীন বিগ্রহ সেবিয়া নাহে কাজ।
নিজ কষ্ট দায় আর লোক মধ্যে লাজ।

ইনি বর্ণাশ্রমের বিরোধী ছিলেন, শূদ্রের প্রতি সামাজিক ঘৃণা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

গঙ্গাদাস সেন এই শতকে সম্ভবত মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু তার সামান্যই পাওয়া গেছে। সমস্ত রচনাগুলির মধ্যে আঠারো শতকের কালগত ও স্থানীয় প্রভাবজাত পরিবর্তন ভীষণ কম বলে মনে হয়।

রোসাঙের রোমান্টিক প্রণয়গাথা সূত্রে কয়েকটি গ্রন্থের রচনা অষ্টাদশ শতকে। ওরা কেউই দৌলৎকাজী-আলাওলের মতো সুপ্রসিদ্ধ নন। কিন্তু ঐ রোমান্টিক প্রণয়কাব্য যে এই শতকে হারিয়ে যায় নি, তার জন্য এদের আলোচনা করা হচ্ছে।

মুহম্মদ আলী রাজা আঠারো শতকের মাঝামাঝি দুটি কাব্য লেখেন। 'তমিম গোলাল চতুর্ণসিলাল' আর 'মিসিরীজমাল'। পরা গল ও মুহম্মদ আলী যথাক্রমে উপাখ্যান ও শাস্ত্রগ্রন্থ উপহার দিয়েছেন। মুহম্মদ রফিউদ্দীন প্রণয়োপাখ্যান লেখেন।

আঠারো শতকে প্রণয়োপাখ্যান লেখেন হিন্দু কবিরাও। দ্বিজ পশুপতির চন্দ্রাবলী, গোপীনাথ দাস মনোহর-মালতী, রামজয় দাসের শশিচন্দ্রের উপাখ্যান, বাণীরাম ধরের শীতবসন্ত, সুশীল মিশ্রের রূপবান-রূপবতী, মহেশচন্দ্র দাস সয়ফুলতমিজ-ফরুকভান।

বিদেশি বিধর্মী বিজাতি এসে দেশ দখল করলেও দেশের মানুষ তা মানতে পারে না। যদিও যাকে বলি দেশপ্রেম (patriotism) তাও সুনির্দিষ্ট ছিল না। শাস্ত্র সমাজ আচারের দিকে একালের মানুষের থেকে আঠারো শতকের বাঙালি ছিল আলাদা আবার রক্ষণশীল (conservative)। ফলে ধর্মকে কেন্দ্র করে সমাজের বিভিন্ন অংশে আলাদা আলাদা ঐক্য গড়ে উঠেছিল (religious affinity)।

আব্দুল হালিম বা আলিম লিখেছিলেন যুদ্ধকাব্য (war poem) বা জঙ্গনামা। তিনি আঠারো শতকের শেষদিকের কবি। এর বিষয় ছিল হানিফার লড়াই। এ কাব্য রচনায় যুদ্ধের উন্মাদনার পাশাপাশি বিলাপের করুণাধারা বয়ে গেছে। বারমাস্যা, মরমিয়া সাহিত্য, কারবালা কাব্য ধারায় মানুষের অশ্রুজড়িত যন্ত্রণার রোল বারবার ধরা পড়ছে। যুদ্ধের আড়ালে যে পারিবারিক বিনষ্টির কথা থাকে, সেখানে 'Home they brought her warorior dead' লিখিত হয় ইংরাজিতে, বাংলায় এসব কাব্যে মানুষের বেদনা, হৃদয়ের শূন্যতা মূর্ত হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এ নিয়ে সরাসরি বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত ইতিহাসকারেরা ধর্মীয় কারণে নীরবতা পালন করেছেন।

১১.৪ সারাংশ

অষ্টাদশ শতকে রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থা চরম আকার ধারণ করলেও বাঙালি শিল্প সাহিত্যচর্চা থেকে বিরত থাকেনি। কাব্যের জগতে বৈষ্ণব পদকর্তার সংখ্যা কমতে থাকে, মঙ্গলকাব্যের ধারাতেও নতুনত্ব দেখা যায়। ভারতচন্দ্র 'নূতনমঙ্গল' রচনা করলেন। 'নূতন' অর্থাৎ নতুন ধরনের মঙ্গলকাব্য রচনা করলেন—অন্নদামঙ্গল, মঙ্গলকাব্য ধারার গতানুগতিকতা থেকে সরে এসে। শাক্তপদাবলীর উদ্ভব হল; রামপ্রসাদ সেনের মাধ্যমে। তাছাড়াও, দেবদেবী, ধর্মের বাইরে নরনারীর প্রণয়োপাখ্যানও লেখা হল। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কবিরাই প্রণয়োপাখ্যান লিখলেন।

একক ১২ ❑ অষ্টাদশ শতকে বাংলার সংস্কৃতি-২

গঠন

১২.১ উদ্দেশ্য
১২.২ প্রস্তাবনা
১২.৩ অষ্টাদশ শতকে বাংলার সংস্কৃতি-দ্বিতীয় পর্যায়
১২.৪ গদ্যের শুরু : পর্তুগীজ ও শ্রীরামপুর মিশনারি
১২.৫ সারাংশ
১২.৬ অনুশীলনী
১২.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১২.১ উদ্দেশ্য

আগের এককে অষ্টাদশ শতকের প্রেক্ষাপট, সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থার ও সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। বর্তমান এককে তৎকালীন বঙ্গদেশের সাহিত্য ও শিল্পের পরিচয় দেওয়া হবে।

১২.২ প্রস্তাবনা

অষ্টাদশ শতকের শুরু থেকেই সমগ্র দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতায় সাধারণ মানুষ বিপর্যস্ত ছিল। বাঙালিরও সেই একই অবস্থা—একথা আগেই আলোচিত হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে, বৈষ্ণব ভাবধারা ও মঙ্গলকাব্যের ধারায় পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। মঙ্গল কাব্যধারায় গতানুগতিকতার পরিবর্তে ভারতচন্দ্র নতুন যুগের সূচনা করলেন। অপরদিকে বৈষ্ণবধারা স্তিমিত হতে শুরু করে। আর সূত্রপাত হয় শাক্ত পদাবলীর। শক্তিসাধনা বঙ্গদেশে ছিলই। কিন্তু রচনা বা গান করা ব্যাপারটি স্বাভাবিক ছিল না, কেন না শক্তিসাধনার সঙ্গে তান্ত্রিক ও কাপালিকরা জড়িয়ে ছিল। সাধারণ মানুষ থেকে তারা অনেক দূরের ও ভয়ের কারণ ছিল। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি রামপ্রসাদ সেনের সঙ্গীত রচনায় ও সঙ্গীতসাধনায়, শাক্ত পদাবলী রচনার সূচনা হল।

অপরদিকে এই শতকেই ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্যের সঙ্গে শাসন ব্যবস্থায় যুক্ত হওয়া, বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে পরিবর্তন আনল। শ্রীরামপুর মিশন স্থাপন, ছাপাখানার আয়োজন বাঙালি জীবনে দিক পরিবর্তনের সূচনা করল। বর্তমান এককে তারই পরিচয়।

১২.৩ অষ্টাদশ শতকে বাংলার সংস্কৃতি-দ্বিতীয় পর্যায়

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সেন

আঠারো শতকের শেষে রামানন্দ যতি মুকুন্দ ও ভারতচন্দ্রের অনুসরণে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। অথচ কাব্যের মধ্যে মুকুন্দ চক্রবর্তীর দোষ সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। মুকুন্দের কাব্যত্রুটির মূলে যে অসঙ্গতি বা অনৌচিত্য, তাই রামানন্দের সমালোচনার বিষয়।

মুক্তারাম সেন, জয়নারায়ণ সেন, ভবানীশঙ্কর দাস, কবীন্দ্র অকিঞ্চন চক্রবর্তী, দ্বিজ জনার্দনও এই শতকে চণ্ডীকাব্য লিখছেন।

আমাদের এবার অষ্টাদশ শতকের দুই শ্রেষ্ঠ কবির কথায় যেতে হয়। তারা হলেন ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর এবং রামপ্রসাদ সেন। এরা দুজনেই বাংলা আখ্যানকাব্য ও পদাবলীকে চরম স্তরে উন্নীত করেছিলেন। ভারতচন্দ্র অন্নদাকথা লিখলেন। অন্নহীনের দেশে এই নবদেবী সাগ্রহে গৃহীত হল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যিনি তার পৃষ্ঠপোষক তাকে বলতে পেরেছেন কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌযট্টি কলায়। এর অন্তর্নিহিত শ্লেষ কি সভাজনেরা বুঝেন নি? সারা জীবন নানান অপমান ও নির্যাতনের শিকার ভারতচন্দ্র জীবনে শান্তি পান নি। এই অতৃপ্ত মানুষটি ১৭১২-তে জন্মগ্রহণ করে অষ্টাদশের মাঝামাঝি তিন খণ্ডে পৌরাণিক আখ্যানের নবীন ভাষ্য দিলেন। শিব সেখানে রাস্তায় বালকদের হাতে অপমানিত হন, নিজের মহিমা নিজেই ঘোষণা করেন (যেমন আজকাল আত্মপ্রচারই হাতিয়ার), লালসা জর্জরিত চেহারায় দেবমহিমা (যদি কিছু থাকে) থেকে ভ্রষ্ট হন। অন্নদা শিবকে ক্ষুধার্ত করে, পথের ভিখারি করে নানান হেনস্থায় নিজের কাছে অন্নভিক্ষার জন্য আসতে বাধ্য করেন। স্ত্রীর এই দাপট ও কূটকচালি এ যুগেও মেলা কঠিন।

একই সঙ্গে মুকুন্দের উচ্চ প্রশংসা করেন, নিজের কবিভাষা নির্মাণ করেন, অষ্টাদশ শতকের নারীশিকারী এবং যৌন মিলনের গোপন প্রেক্ষাপট রাজকাহিনিতে স্থাপন করেন বর্ধমান রাজকে অপদস্থ করার জন্য। আবার ঐ বইয়ের তৃতীয় খণ্ডে 'মানসিংহ'-এ কবিমন হেরে গেলেও ইতিহাসের ব্যাখ্যান কর্ম করেন নিজের সাধ্যমতো।

ভারতচন্দ্র হলেন মধ্যযুগের শেষ কবি যিনি ব্যক্তিত্ব এবং Art ও Knowledge-এর মিশ্রণে নতুন কিছু করতে পারলেন। মঙ্গলকাব্যের বিলীয়মান জগতে নিজের ব্যক্তিত্বে; অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতকে বিদ্ধ করেছেন। তার লেখা যুগের প্রভাবে খানিকটা তিক্ত স্বাদ বয়ে আনে। অষ্টাদশে যে যুক্তি বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, সমাজকে বাঁকা চোখে দেখার দক্ষতা জন্মেছিল, ভারতচন্দ্র তারই সদ্ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর মধ্যে যুগোচিত বৈশিষ্ট্য যেমন লক্ষ করি, তেমনি তিনি ছন্দজ্ঞান, অলংকার নিপুণতার জন্য সংস্কৃত ছন্দের বঙ্গীকরণ করেছেন। এই ছন্দের সময়োচিত পরিবর্তন, পরিবর্ধন তাঁর বিশেষ কবিপ্রকরণের অংশ। সমস্ত যুগ, পুরাণ কথাকে তির্যক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলেন। তির্যক দৃষ্টির এই বৈচিত্র্যমালা অন্য কবির কাব্যে মেলে না। সার্বিকভাবে ভারতচন্দ্র যুগন্ধর কবি। পাশাপাশি বাঙালিকে দেবতার মহিমাকল্যাণ থেকে বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত করা তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব।

ভারতচন্দ্র নিজে পুথি লিখলেও তা গানের সময় শ্রোতা অনুসারে, তাদের চাহিদা অনুসারে পালটে দিতেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ছাপা হয়েছিল উনিশ শতকের গোড়ায়। পাণ্ডুলিপি কেউই দেখেন নি। শোনা যায় তা রয়েছে ফরাসি কোনো গ্রন্থাগারে। বাঙালি কবিদের কারোরই মূল পুথি পাই না। বরং বারবার তা নকল করতে গিয়ে বদল ঘটেছে। সেই বদলানো লিপ্যন্তর নিদর্শন নিয়ে কত বিতর্ক, উত্তেজনা চলছে। ভুলে যাচ্ছি বাংলা প্রবাদ 'সাত নকলে আসল খাস্তা' অর্থাৎ বারবার নকল হলে আসল বস্তু হারিয়ে যায়। আমাদের বক্তব্য হল যে মধ্যযুগের এই আধুনিক চেতনার কবির কোনো মূল পাণ্ডুলিপি (কখনও পেলে) আমাদের ভারতচন্দ্র অধ্যয়নকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

দেবদেবীর করুণা বা অকরুণা মানুষের জীবনকে পলকে বদলাতে পারে—এটা মধ্যযুগের অনেক কবির মতো ভারতচন্দ্রও দেখিয়েছেন। তবে দেবতাকে অন্নহীন করে দিয়ে অভুক্ত মানুষের মিছিলে সামিল করা তাঁর মানবতাবাদেরই সাক্ষ্য। হরিহোড়কে নিঃস্ব অবস্থা থেকে ধনী করলেন অযাচিত করুণায়। আবার তার সাংসারিক বিবাদে দেবী ব্যথিত হয়ে তাকে নিঃস্ব করলেন। এখানে দেবী খুব সাংসারিক দুঃখে ব্যথা পেলেন কেন, তা অকথিত থাকে নি। তিনি হরিহোড়ের বদলে কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারকে নব্যধনী দেখতে চান। তাই হরিহোড় নিঃস্বতার আড়ালে চলে গেলেন, ভবানন্দ নতুন ধনী সমাজের প্রতিনিধি হলেন। যে ভবানন্দের উত্তরপুরুষ কৃষ্ণচন্দ্রকে যথেচ্ছ সমালোচনা নানা সময় কাব্যে করেছেন, তার পাপস্খালন করলেন ভবানন্দকে কৃপা করে।

যেমন বিদ্যাসুন্দরের যৌবনলীলার অকুস্থল (location) হয়েছে বর্ধমানের রাজগৃহ। অল্প বয়সে ভারতচন্দ্র টাকা পয়সার পাওনা নিয়ে বর্ধমান রাজার বিরাগভাজন হন। তাঁর কারাদণ্ডও হয়। নিরীহ আবেদনকারীর প্রথম জীবনে কারাবাস ঘটেছিল তুচ্ছ কারণে। ভারতচন্দ্রের মনে তা ঘৃণা ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। ফলে অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ডে যে রাজপরিবারের চারিত্রিক শিথিলতা ও অবৈধ কামনাপূরণের সর্পিল উপায় দেখা যায়, তার লক্ষ হয়েছিল বর্ধমান রাজপরিবারে অন্দরমহল। জমিদার রাজা বা নবাবদের, এক কথায় ধনী সমাজের ভোগবিলাস, কামনার যথেচ্ছাচার সবাই জানতেন। কিন্তু সংস্কৃত চৌরপঞ্চাশিকার সাহায্য নিয়ে তাকে অষ্টাদশ শতকের সমাজমানসে কামকলাকুতূহল ছিল, সেটি ভারতচন্দ্র চিত্ররূপ দিলেন।

একদিকে তা যেমন আমাদের পর্ণোগ্রাফির তাগিদ মিটিয়েছে, তেমনি অষ্টাদশে নব্যধনীসমাজের বাসনাঘন মদিরতাকে তা উন্মোচিত করেছে। অথচ সংস্কৃত প্রাকৃত যৌনকাহিনীর কাঠামো সেখানে অনুসৃত হলেও বিদ্যাসুন্দরে একটা শিল্পজ্ঞানের নমুনা পেয়েছেন প্রমথ চৌধুরীর মতো অভিজাত রুচিবান লেখকেরা। হয়তো কোনো কোনো অংশে রিরংসা ফুটে ওঠে, কিন্তু তাও তো প্রাচীন সাহিত্যের ঐতিহ্যবহ উত্তরাধিকার। ভারতচন্দ্র এভাবে যুগের উচ্চবিত্ত অংশের কামনার অলি-গলিকে সাহিত্যে নিয়ে এলেন।

আসলে সপ্তদশ থেকেই সাহিত্যে সংস্কৃতিতে কামবিলাস গুরুতর হয়ে উঠেছিল। বৈষ্ণব কবিতায় যেমন এটি হীনায়ন (degradation) ঘটিয়েছে, তেমনি অন্যান্য শাখায় প্রকাশিত হতে উন্মুখ হয়েছে।

সাহিত্য সংস্কৃতি হল যুগাত্মা (spirit of the age) এবং ব্যক্তিত্বের (stamp of personality) সমাহার-বিন্যাসের সংঘাতচিত্র। ভারতচন্দ্র তাঁকেই কাব্যরূপ দিয়েছেন, এছাড়া তাঁর কোনো দায় ছিল না।

রামপ্রসাদ সেন

ভারতচন্দ্রকে যদি অশ্লীলতায় অভিযুক্ত করি, তাহলে শ্যামাসঙ্গীতের অসামান্য রচক রামপ্রসাদ সেন কেন বিদ্যাসুন্দর লিখলেন? এখানে রামপ্রসাদ ঐতিহ্যের পুনরাবৃত্তি গ্রহণ করলেও ভারতচন্দ্রের মতো তা শিল্পশোভন হয় নি। এখানে শ্লীলতার অভাব আর পণ্ডিতীয়ানা দুটোই আছে। কবির প্রথম যৌবনে এই রচনা আশ্চর্যভাবে যুগের চাহিদা পূরণে ব্যস্ত হয়েছিল।

অষ্টাদশের মাঝামাঝি কীর্তন থেকে পাঁচালীর ঢং-য়ে যেসব রচনা নির্মিত হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে রামপ্রসাদের কালীকীর্তনও পড়ে। কৃষ্ণলীলার অনুকরণে দেবীলীলা লেখা হল।

এসব রচনার মধ্যে আমরা রচনাসিদ্ধ (complete writer) রামপ্রসাদকে খুঁজে পাই না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্যক্তি বা বস্তুকে তার ক্রয়মূল্যে (selling price) মাপা হত। সেই যন্ত্রণা, রাজকীয় ও জমিদারী অত্যাচার, নীরক্ত শস্যখেত, চারিদিকে অভাবের বিশৃংখলতার কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়েছিল। রামপ্রসাদ তাঁর শ্যামাসঙ্গীতের অন্তর্গত করেছেন। একে অনেকে রামপ্রসাদী বা প্রসাদীসঙ্গীতও বলতে চান।

একটা কেন্দ্রীয় সংস্থিতির (pivotal balance) অভাবে জীবনের টলোমলো অবস্থায় কিছুকে আঁকড়ে ধরতে হয়। তিনি হয়তো জীবনযাপনকে মসৃণ করবেন, এমনি বেদনাময় আকৃতি জনমনে দেবীর এক নবীন রূপ গড়ে তুলল। মঙ্গলকাব্যে দেবী ছলনাময়ী অলৌকিকতা কখনও নৃশংস প্রতিহিংসাকামী। আবার তিনি বরদা, হারানো প্রাপ্তির দেবীও বটে। রামপ্রসাদ যে কালীকে তার পদাবলীতে আঁকলেন, তিনি বাইরের নন, ঘরের। চেনাজানা মা মেয়ের শান্তশ্রী, প্রতিকাররূপ সেখানে মূর্ত হল। এই যে শক্তিদেবীকে ঘরসংসারের একজন করে নেওয়া, এটা হল অষ্টাদশ শতকের আরেকটি যুগলঘন (feature of the age)। ক্রমাগত দেবীর ঐশ্বর্য ভয়ংকরী শ্মশানবাসী রূপ থেকে ঘরোয়া সম্পর্কে, সামাজিক সম্পর্কে তাকে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। কতকগুলি উদাহরণ হয়তো আমাদের বক্তব্যকে আরও বেশি প্রাঞ্জল করে তুলবে—

১. তারা কোন অপরাধে এ দীর্ঘমেয়াদে সংসার গারদে থাকি বল।

২. কেবল আশার আশা, ভবে আসা, আসামাত্র হল।

৩. চাই না আমি বড় হতে / আমি আর পারি নে বাঁধা অহং শৃংখলেতে।

৪. যে হয় পাষাণের মেয়ে / তার হৃদে কি দয়া থাকে।

৫. সময় থাকবে না তো মা কেবলমাত্র কথা রবে।
কথা রবে কথা রবে মা গো জগতে কলঙ্ক রবে।।

দেবীকে ঘরোয়া করেও তার মহান মহাজাগতিক রূপ মনে থাকে। ফলে শাক্ত পদাবলীর এক বিশেষ পর্যায় 'ভক্তের আকুতি' শুধুরামপ্রসাদেই নয়, কমলাকান্ত আদি শাক্ত কবিরা দেবীকে কাঙালিনী করেছেন, আবার ইহজীবনেই আনন্দময়ীর ছোঁয়ায় জীবনের এক আনন্দরূপের স্পর্শ পাওয়ার গভীর আকুলতা বলিয়েছে—'ভালো ভালোয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই'।

শাক্তসঙ্গীত বাঙালির জীবনে দৈবীমহিমাকে গৃহগত প্রাণময়ী করে তুলেছে, সামাজিক অত্যাচার-অনাচারের প্রতিকার চেয়েছে, আবার দেবী দ্যুলোক ভূলোক ভেদিয়া যে স্বরূপ তাকে অর্ঘ্য নিবেদন করেছে। রামপ্রসাদের গানের যে অপার সর্বজনীনতা তা প্রকাশিত হয়েছে তার সচিত্র ফরাসি অনুবাদে। বাঙালি জীবনে শাক্ত পদাবলীর বহু পংক্তি প্রবাদের মতো অনায়াসে ব্যবহার করা হয়। অষ্টাদশ শতকের কাব্যধারার এই বিশেষ রূপারোপ যুগের অবক্ষয় তুলে ধরেছে, পাশে সুস্থির জীবনের স্বপ্নও।

১২.৪ গদ্যের শুরু : পর্তুগীজ ও শ্রীরামপুর মিশনারি

আমরা এতক্ষণ যেমন অষ্টাদশের দুই দিকপাল কবির কথা জানলাম, তেমনি এই শতকে এল বাংলা গদ্যের প্রাথমিক নমুনা, তার সামান্য বিস্তার ভূমি।

১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে লিসবনে মুদ্রিত হল রোমান হরফে মানুয়েল দ্য আসসুঁমসাউয়ের ও দোম আন্তনিওর লেখা 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ', বাঙ্গালা-পর্তুগীজ শব্দকোষ (lexical dictionary), ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ। পাদ্রী দোমোনিক দ্য সুজার খ্রিস্টধর্মসংলাপ, ফ্রান্সিস ফার্নান্দেস ও পাদ্রী বিয়েরের কড়চা জাতীয় রচনা বেরিয়েছিল। এদের পরপর না সাজিয়ে বিষয় বৈচিত্র্যে বলা হল।

শাসনসম্বন্ধীয় কয়েকটি অনুবাদ বেরিয়েছিল : হ্যালহেডের বিবাদীর্ণবসেতু (মূল ফার্সি), A grammer of the Bengal Language (১৭৭৮), জোনাথান ডানকানের ইম্পে কোড-অনুবাদ (১৭৮৫), এডমিনস্টোনের ফৌজদারী দণ্ডবিধি (১৭৯০-৯২), ফার্টরের কর্ণওয়ালিশ-কোডের অনুবাদ (১৭৯৩)। দেখা যাচ্ছে যে মূলত ধর্ম ও আইন ছিল বাংলা গদ্যের প্রথম নমুনা। এখানে দুটি ব্যাপার ঘটেছিল—১. বাংলা গদ্য গড়ে না ওঠারও বিষয় গম্ভীরতা বজায় রাখার জন্য আড়ষ্টতা ২. বাংলা ব্যাকরণ হ্যালহেড (হালেদ) লিখলেও তাকে ঠিক বাংলা গদ্যের প্রয়াস বলা যায় না। বরং তিনি ব্যাকরণের উল্লেখ করতে গিয়ে উপাদানরূপে বাংলা কবিতা ও অন্যান্য সূত্রের সাহায্য নিয়েছেন।

শ্রীরামপুর মিশন খ্রিস্টধর্ম প্রচার-প্রসারে উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু এখানকার রচনাগুলি অষ্টাদশের শেষ-উনিশ শতকের প্রথম দিকের (১৮০০) লেখা। এর মধ্যে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন ১৮০০-এর গোড়ায় হলেও প্রেসের কাজ শুরু হয়েছিল কয়েক মাস পরে। এরা প্রথমে বাইবেল এবং প্রচারপত্র ছাপালেও পরে বাংলা গ্রন্থ, সংবাদপত্র এবং গদ্যভাষা নির্মাণে কালোপযোগী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এর কেন্দ্রে ছিলেন উইলিয়ম কেরী, জন টমাস এবং জোশুয়া মার্সম্যান। শুধু বাংলা নয় বিভিন্ন ভারতীয়

ভাষা ও বিদেশি ধর্মী ও চিনা ভাষাতেও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থাৎ শ্রীরামপুর মিশন ধর্মকেন্দ্রিক এক আন্তর্জাতিক বলয় গড়ে তোলায় নিয়োজিত ছিল।

শ্রীরামপুর মিশনের প্রকাশনার স্থান পেয়েছিল—১. খ্রিস্টধর্ম ২. প্রাচীন রচনার পুনর্মুদ্রণ ৩. নতুন পাঠ্যপুস্তক। এখানেই প্রথম পঞ্চানন কর্মকার (পেশায় লিপিকার) বাংলা অক্ষর ঢালাই করে মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। তাঁর শিষ্য মনোহর কর্মকার শিল্পকুশলতায় পঞ্চানন কর্মকারের উদ্যোগকে আরও ফলবান করেন।

১৮০০ সালে প্রথম ইংরেজ বালক বালিকার জন্য শ্রীরামপুরে স্কুল খোলা হল। বাঙালিদের জন্য গড়ে উঠেছিল অবৈতনিক পাঠশালা। এখানে বাংলা শেখানো হত। মিশনারী প্রবরেরা বুঝেছিলেন মাতৃভাষা জন্মসূত্রে লব্ধ হলেও তার শিক্ষাদানও জরুরি কর্তব্য।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দেই ২৪শে নভেম্বরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১৮৫৪ অবধি টিকে থাকলেও রামমোহন—হিন্দু কলেজ এবং স্বদেশী সংবাদপত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টেঁকে নি। এই কলেজে পাদ্রিরা শিক্ষক ছিলেন। তবু অসাম্প্রদায়িক চেতনা সেখানে ছিল। এখানে প্রকাশিত গদ্যসংগ্রহ যতটা না সাহিত্যশ্রী অর্জন করেছিল, তার চেয়ে বেশি তা ভাষা শিক্ষা ইংরেজ কোম্পানি কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শেখানোয় ব্যস্ত ছিল। এদের কাজ ছিল পাঠ্যবই লেখা, সাহিত্য রচনা নয়। অথচ বাংলায় সাহিত্য রচনায় (যা আসলে পাঠ্যপুস্তক) উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কার দেওয়া হত।

আমরা ফোর্ট উইলিয়মের গদ্যচর্চা নিয়ে আর কথা বিস্তার করব না। কারণ সেখানকার কাজকর্ম সবকিছু উনিশ শতকে আমরা শুধু দেখালাম যে শ্রীরামপুর মিশনের পাশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেও বাংলা ইত্যাদি ভাষাচর্চা শুরু হয়েছিল। বাঙালি মুদ্রিত গ্রন্থ পেল। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অনুবাদ করল। বাংলা ভাষার একটা আদর্শ (norm or standard) গড়ার প্রয়াস চলল। অনেকে আবার রাজভাষা ফার্সির প্রভাব সরিয়ে ইংরেজি অক্ষর রীতির প্রভাব স্বীকার করলেন।

অষ্টাদশে এভাবে বাঙালি মনীষা প্রাথমিকভাবে বিদেশিদের হাত ধরে নিজের ভাষার সৃষ্টিসামর্থে আস্থা রাখতে সক্ষম হল। শুরু হল সাধু পণ্ডিতী গদ্যের চর্চা। আসলে বাংলা গদ্যের শিকড় হয়েছিল যুক্তির গদ্যে। তা থেকে সৃষ্টির গদ্য বা সাহিত্যভাষা অর্জন করতে তার কিছুটা সময় লেগেছিল।

১২.৫ সারাংশ

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার শাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। দীর্ঘকালের ইসলামি শাসনের পরিবর্তে ইংরেজদের শাসনে আসে বাংলা। তার প্রভাব এই শতকের শেষ ভাগ থেকে লক্ষ করা গেছে। এমনিতেই কাব্যসঙ্গীত প্রভৃতি দিকে নতুনত্বের সূচনা হয় ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত প্রমুখ কবির রচনায়। আর তাদের রচনায় পূর্ববর্তী শতকের ভক্তিবাদের পরিবর্তে ভোগবাদ বড় হয়ে দেখা যায় বিশেষত ভারতচন্দ্রের রচনায়। রামপ্রসাদের শাক্তগীতি বাংলায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। আবার এই শতকের শেষে ইংরেজ মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুর মিশন

প্রতিষ্ঠা ও ছাপাখানা স্থাপন ও বইছাপার উদ্যোগ বাঙালিকে প্রভাবিত করল। দেখা দিল নতুন সংস্কৃতির আভাস যা ঊনবিংশ শতকে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।

১২.৬ অনুশীলনী

১। চৈতন্যকে এই এককের ভূমিকায় কীভাবে দেখতে চাওয়া হয়েছে, সেই ধারণাটি বিশদ করুন।

২। চৈতন্যজীবনকথার গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলি বর্ণনা করুন।

৩। চৈতন্যের প্রভাব বাংলা সংস্কৃতিকে কীভাবে পরিবর্তিত করেছিল, তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৪। চৈতন্যের জীবনী সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।

৫। পদাবলী ও মঙ্গলকাব্যে চৈতন্যের প্রভাবে কী ঘটেছিল, তা বিশদ করুন।

৬। সমাজে চৈতন্য জীবনাচরণ কোন কোন আদর্শ তুলে ধরেছিলেন, মানুষের কাছে, তা বিশ্লেষণ করুন।

৭। চৈতন্যের আদর্শ প্রচারে যেসব ব্যক্তি আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাদের নামোল্লেখ করে চৈতন্যের উড়িষ্যা যাত্রার মূল কারণটি চিহ্নিত করুন।

৮। চৈতন্যের উত্তরকালে বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃতির কী রূপান্তর দেখা দিয়েছিল, তা আলোচনা করুন।

৯। অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকা আলোচনা করুন।

১০। আঠারো শতকের কবিশিরোমণি ভারতচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। চৈতন্যের সমকালে ভারতে কটি বৈষ্ণবীয় ধারা প্রচলিত ছিল? তাদের উল্লেখ করুন।

২। গৌরচন্দ্রিকা বলতে কী বোঝায়?

৩। চৈতন্য জীবনী কাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

৪। কোন সুলতানের সময় মথুরায় তীর্থযাত্রা বন্ধ ছিল?

৫। মঠ মন্দিরে বৈষ্ণবীদের থাকায় কী ঘটেছিল?

৬। পলাশীর যুদ্ধে কারা সিরাজের বিরুদ্ধে একত্র হয়েছিলেন?

৭। যুদ্ধকাব্যের একজন কবির নামোল্লেখ করুন।

৮। রামানন্দ যতি মুকুন্দ চক্রবর্তীর কোন দোষের সমালোচনা করেছিলেন?

৯। অন্নদামঙ্গলের খণ্ড কটির নামোল্লেখ করুন।

১০। হিন্দুরা অষ্টাদশ শতকে যে প্রণয়োপাখ্যান লিখেছিলেন, তাদের একজনের নামোল্লেখ করুন।

১২.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। 'বাংলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব'—আহমদশরীফ

২। 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস'—সজনীকান্ত দাস

৩। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'—সুকুমার সেন

৪। 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে'—কালিদাস রায়

৫। 'Early Bengali Prose' - Sisir Kumar Das

মডিউল : ৪

উনিশ-বিশ শতকে বাংলার সংস্কৃতি, মন্বন্তর, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু আন্দোলন

একক ১৩ ❑ উনিশ ও বিশ শতকে বাংলার সংস্কৃতি-১

গঠন

১৩.১ উদ্দেশ্য

১৩.২ প্রস্তাবনা

১৩.৩ উনিশ ও বিশ শতকে বাংলার সংস্কৃতি-প্রথম পর্যায়

১৩.৪ সারাংশ

১৩.১ উদ্দেশ্য

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর অর্থাৎ ইংরেজ বণিকদের বাংলার শাসনভার হাতে নেওয়ার পর বাংলার মানুষের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, সেই পরিবর্তনের ফল লক্ষ করা যায় বাঙালির শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিতে নতুনত্বের আভাসে। আমাদের শিক্ষার্থীদের সে বিষয়ে অবহিত করাই এই একক দ্বয়ের (১৩, ১৪) উদ্দেশ্য।

১৩.২ প্রস্তাবনা

অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকেই ইউরোপীয় শাসনের প্রভাব পড়তে থাকে বাঙালির জীবনে। বাঙালির জীবন দীর্ঘকালের মুসলমান শাসন ও তার অধীন ক্ষুদ্র রাজাদের সান্নিধ্যে গতানুগতিকতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। যেহেতু রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা প্রজাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে, বাঙালির জীবনেও তাই ঘটেছিল। সেই বৈষ্ণবকাব্য, মঙ্গলকাব্য, দেবদেবীর পূজা-আরাধনা, দৈবের প্রতি বিশ্বাস ও আকর্ষণ, রাজতোষণ সবই চলছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষে বৈষ্ণব প্রভাব স্তিমিত হতে থাকে, মঙ্গলকাব্যেও নতুনত্ব দেখা যায়। একই সঙ্গে শাক্তগীতি রচনার সূত্রপাত হয়। তারপর ইংরেজদের শাসনে বাঙালির পরিবর্তন ঘটে। শাসকের চালচলন, আচার-আচরণ, জীবনযাত্রা বাঙালিকে প্রভাবিত করতে শুরু করে—ইসলামি ব্যবস্থার পরিবর্তে সাহেবি চালচলনকে বাঙালি ক্রমশ গ্রহণ করতে থাকে। অষ্টাদশ শতকে তা স্পষ্ট না হলেও উনিশ শতকে তা পরিষ্কার হয়ে গেল। তাঁর জীবনচর্যা, শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্য সবকিছুতেই শাসকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ছাপ পড়তে থাকে। বর্তমান এককে উনিশ শতকের সংস্কৃতির পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা।

১৩.৩ উনিশ ও বিশ শতকে বাংলার সংস্কৃতি : প্রথম পর্যায়

কোনো দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয় কোনো নির্দিষ্ট সন তারিখ দিয়ে বিচার করা যায় না।

কোনো একটা আনুমানিক কালসীমা ধরে তার পরিচয় উদ্ধার করা হয়। সেই কালসীমায় কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যেমন শাসক বদল, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, প্রভৃতি ঘটলে তাকে সীমারেখা ধরে নেওয়া হয়।

উনিশ বিশ শতকের বাংলার সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনায় তাই তার পটভূমির পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন। প্রসঙ্গত 'সংস্কৃতি' শব্দটিরও ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। আমরা যে 'সংস্কৃতি' শব্দটি ব্যবহার করি সেটি ইংরাজি 'culture' শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে। 'সংস্কৃতি' শব্দটি বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও আছে, তার অর্থ—মার্জিত, সংস্কার করা হয়েছে এমন। ইংরাজি culture শব্দের উপযুক্ত প্রতিশব্দের সন্ধানে পণ্ডিতমহলে ব্যাপক আন্দোলন হয়। কেউ কেউ সংস্কৃত 'কৃষ্টি' শব্দটি ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেটি পছন্দ নয়, কেননা বেদে 'কৃষ্টি' বলতে tribe বা জাতি-জনজাতি হিসাবে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। আবার কিছু মুসলমান পণ্ডিত আরবি 'তমদ্দুন' শব্দটি culture-এর প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহারের পক্ষপাতী। কিন্তু এই শব্দটি ব্যবহারে আপত্তি তোলেন অনেকেই। 'তমদ্দুন' শব্দের সঙ্গে নগর-সভ্যতার ব্যাপার জড়িয়ে আছে। আরবি তমদ্দুনের সঙ্গে মদিনা শহরের সম্পর্ক দেখা যায়। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক নয়, গ্রামভিত্তিক। তাই 'তমদ্দুন' শব্দটি গ্রহণ করা যায় না। শেষে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের কাছে 'সংস্কৃতি' ব্যবহারের পরামর্শ দেন এবং রবীন্দ্রনাথ সেই শব্দটি ব্যবহারে মত দেন। তাই বর্তমানে culture-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'সংস্কৃতি'-ই চলছে। এ বিষয়ে সুনীতিকুমারের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে—"Civilisation বা সভ্যতা বললে আমরা ব্যাপকভাবে উৎকর্ষপ্রাপ্ত বা উন্নত মানবসমাজের বহিরঙ্গ—তার উন্নত জীবনযাত্রা-পদ্ধতি, তাহার সামাজিক রীতিনীতি, তাহার রাষ্ট্রনীতি, তাহার রূপশিল্প, বাস্তুশিল্প, পূর্ত, সাধারণভাবে তাহার সাহিত্য ও ধর্ম, এইসব বুঝি; এবং culture বা সংস্কৃতি বলিলে বুঝি—তাহার উন্নত জীবনের অন্তরঙ্গ বস্তুগুলি—তাহার আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন, তাহার সামাজিক জীবনের সৌন্দর্যময় প্রকাশ; তাহার সাহিত্য ও সৌন্দর্যবোধ; তাহার বাহ্য সভ্যতার আভ্যন্তর প্রাণবন্ত যাহা, মুখ্যতঃ তাহাই বুঝি। সভ্যতাতরুর পুষ্প যেন সংস্কৃতি।"—[দ্র. 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধ। "একালের প্রবন্ধ সঞ্চয়ন", কলি. বিশ্ব, ১৯৯২, পৃ. ৪৫]

ভাষাচার্যের বক্তব্য থেকে একথা স্পষ্ট যে মানবসমাজের বহিরঙ্গের কীর্তিকলাপকে সভ্যতা বলা যায় আর, তার মানবিক অনুভূতি, ভাবনা বিস্তার যে ফসল তাই সংস্কৃতি। মানুষের বাহ্য ক্রিয়াকলাপের বাইরে তাদের চিন্তা চেতনার সূক্ষ্ম বিকাশ যার মাধ্যমে হয় তাকে সংস্কৃতি বলা যেতে পারে, কিন্তু তা সভ্যতার হাত ধরেই। কারণ সভ্যতাতরুর পুষ্প হল সংস্কৃতি। বাহ্য যুদ্ধবিগ্রহ, সমাজ-শাসনের মধ্য থেকেই মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। আর যেহেতু সেই সামাজিক রাজনৈতিক ব্যাপারটি মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায়, তাই তার প্রভাব পড়ে শিল্প সংস্কৃতিতে।

উনিশ বিশ শতকের সংস্কৃতি চিন্তায় তাই শাসক পরিবর্তনের প্রভাব বাঙালির জীবনে অনুভূতির উপর পড়েছে পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) পর, বিশেষ করে ১৭৬৫ সালের পর বঙ্গদেশ নবাবি শাসন

মুক্ত হয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দখলে চলে গেল। শাসক বদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদেরও নতুন শাসকের প্রতি আনুগত্য জাগতে থাকে। তাদের চালচলন আচার আচরণ প্রভৃতির প্রতি প্রজাদের আকর্ষণ জন্মাতে থাকে। বঙ্গদেশেও তাই ঘটেছে। বাঙালির জীবনযাত্রায়, সংস্কৃতিতে তাই ঘটতে থাকে আলোড়ন। সেই প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও ধর্মভাবনায়।

ইংরেজদের প্রভাব সমাজজীবনে পড়তে শুরু করে। কলকাতা বঙ্গদেশের শাসনকেন্দ্র হয়ে ওঠায় বিভিন্ন অঞ্চলে ধনশালী ব্যক্তি, ভাগ্যান্বেষী মানুষ এসে বাসা বাঁধল। সামাজিক জীবনে পরিবর্তন সূচিত হল। ধর্মীয় দিকেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটল। সাহিত্যে দেবদেবী নির্ভরতার পরিবর্তে মানবজীবন বড় হয়ে উঠতে লাগল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ছড়াতেই তার প্রমাণ, ঈশ্বর গুপ্ত অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ দুটি শতাব্দীর মাঝখানে ছিলেন। তাই তিনি মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ দুয়েরই সাক্ষী। তিনি ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন—''তুমি হে আমার বাবা হাবা গঙ্গারাম।'' দেবদেবীর পরিবর্তে তিনি টিয়া, পাঁঠা প্রভৃতি নিয়ে কবিতা লিখলেন।

রামমোহন রায় 'জীবনহারা অচল অসাড়' জাতির দেহে প্রাণসঞ্চারের চেষ্টা করলেন। একেশ্বরবাদী বেদান্ত প্রতিপাদিত ধর্ম (ব্রাহ্মধর্ম নামে পরে পরিচিত হয়েছে) প্রতিষ্ঠা করে নবযুগের সূত্রপাত করলেন. রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের পাশে পরিবর্তনকামী মানুষদের তা আশ্রয়স্থল হয়ে উঠল। রামমোহন রায়ের (১৭৭২) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ ''সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইন'' পাস (১৮২৮)। তিনি বেদান্তের অনুবাদ করে বাঙালি হিন্দুদের কাছে প্রকাশ করলেন। আবার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০ খ্রি.) ''বাল্যবিবাহ রোধ ও বিধবাবিবাহ আইন'' (১৮৫৬) পাশ করান। এরা দুজনেই শুধু সমাজ সংস্কারকই ছিলেন না। বাংলা গদ্যকে তাঁরা দাঁড় করিয়ে ছিলেন সাহিত্যের উপযোগী করে। রামমোহন রায়কে 'বাংলা গদ্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপয়িতা' বলা হয় অর্থাৎ তিনি বাংলা গদ্যের যে কাঠামো তৈরি করেছিলেন আজকের গদ্য সেই কাঠামোর উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। তবে তাঁর গদ্য প্রবন্ধ ও তর্কবিতর্কের গদ্য। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাকে যতি চিহ্নের ব্যবহারের দ্বারা সাহিত্যের উপযোগী হিসাবে গড়ে তোলেন। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছেন, 'বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থক শিল্পী।'

বাংলা গদ্যের চর্চা মূলত ইউরোপীয়দের উদ্যোগে শুরু হয়। তার আগে বাংলা সাহিত্য সবই পদ্যে লেখা হত। ইংরেজরা ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করে তাদের ইউরোপীয় কর্মচারীদের বাংলা ও আঞ্চলিক ভাষা শেখানোর জন্য। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের নামও উল্লেখ করতে হয়, যিনি বাংলা গদ্যকে প্রবন্ধ নিবন্ধের ও পাঠ্যপুস্তক রচনার বাহন হিসাবে গড়ে তুললেন। এরপর উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম করতে হয় যিনি বাংলা গদ্যকে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুললেন।

এই সূত্রে বলতে হয় বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার কথা। ইউরোপীয় বা ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের নতুন রূপ দেখা গেল। দেবদেবীর স্থানে মানুষই হয়ে উঠল প্রধান এবং নারীর স্বাতন্ত্র্যও প্রকাশিত হল বাংলা সাহিত্যে। এসবের জন্য অবশ্যই ইংরাজি শিক্ষা ব্যবস্থার কথা স্মরণ

করতে হয়। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ (প্রেসিডেন্সি) স্থাপিত হয়। স্থাপিত হল আরো কিছু ইংরাজি স্কুল। বেথুন ও বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে তৈরি হল বালিকা বিদ্যালয়। সেই ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব পড়ল বাংলা সাহিত্যের উপর। বাংলা কাব্যে ও নাটকে মধুসূদন দত্ত, কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের নাম বাংলা সাহিত্যকে নতুন দিশা দেখাল।

নাটকের প্রসঙ্গে অবশ্যই বলতে হয় পাশ্চাত্য প্রভাবিত নাটক ও রঙ্গমঞ্চের কথা। গেরাসিম লেবেডফ ১৭৯৫ সালে বাংলা মঞ্চ তৈরি করে 'দি ডিস্‌গাইজ' নাটকের বাংলা অনুবাদ মঞ্চস্থ করেন। তারপরে বাংলায় নাট্যমঞ্চ তৈরি করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বাগবাজার নাট্যশালা, বেলগাছিয়া নাট্যশালা, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সার্থক নাট্যকার হিসাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখ করতে হয়। তারপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও নাটক রচনা করেছেন। মধুসূদনের নাম তো আগেই বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত বাঙালির সামাজিক জীবনের আর একটি দিকের উল্লেখ করতে হয় তা হল কবিগান। বাংলায় রাসযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা, মঙ্গলগীত প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। উনিশ শতকে সবথেকে উল্লেখযোগ্য হল কবিওয়ালাদের গান। গানের মাধ্যমে কোনো বিষয়ের উত্তর প্রত্যুত্তর চলত আসরে বলে তাৎক্ষণিক গান রচনা করে। সেইসময়ের বিখ্যাত কবিওয়ালা হলেন—ভোলা ময়রা, গোঁজলা গুঁই, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি প্রমুখ।

উনিশ শতকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল পত্র-পত্রিকা প্রকাশ। খ্রিস্টান মিশনারীদের উদ্যোগে শ্রীরামপুর মিশন থেকে সাময়িক পত্র প্রকাশের পর বাঙালিরাও উদ্যোগ নেন পত্রিকা প্রকাশের। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও তাঁর পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১)। তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২), ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সে সময়ের উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা।

১৩.৪ সারাংশ

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য প্রভাব বাঙালিকে নতুন দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বাংলার মধ্যযুগের পর আধুনিক যুগের সূচনা হল। বাংলা গদ্যের বিকাশ, ইংরাজি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন, সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব, রামমোহন বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত মুখ বিখ্যাত ব্যক্তির আবির্ভাবে বাংলার নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার প্রভৃতি বাংলায় আধুনিক যুগের লক্ষণীয় ঘটনা।

একক ১৪ ❑ উনিশ ও বিশ শতকে বাংলার সংস্কৃতি-২

গঠন

১৪.১ উদ্দেশ্য

১৪.২ প্রস্তাবনা

১৪.৩ উনিশ বিশ শতকে বাংলার সংস্কৃতি-দ্বিতীয় পর্যায়

১৪.৪ সারাংশ

১৪.১ উদ্দেশ্য

পূর্ববর্তী এককে উনিশ শতকের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু কোনো একটা শতকের সন তারিখ হিসাব করে তার পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয় না। তার জের পরবর্তী শতকেও চলতে থাকে। শিক্ষার্থীদের সেই পরবর্তী অংশ ও বিশ শতকের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

১৪.২ প্রস্তাবনা

উনিশ শতকের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিচয় আগে আলোচনা করেছি এখন বিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রসঙ্গে আসি। উনিশ শতকের বিশেষত্ব শতকের হিসাব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমাপ্ত হয় না। এটা একটা ধারাবাহিক গতিশীল অবস্থা। তাই উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহকেরা বিশ শতকেও বর্তমান। সেইজন্য গত শতকের বৈশিষ্ট্য এ শতকেও থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাই গত শতাব্দীর সমাজের ছবি বিশ শতকেও থাকবে। যাই হোক, আমরা বিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করি এই অধ্যায়ে।

১৪.৩ উনিশ ও বিশ শতকে বাংলার সংস্কৃতি : দ্বিতীয় পর্যায়

উনিশ শতকের বঙ্গদেশে সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হয়। কুসংস্কারে দীর্ণ স্থবির হিন্দুত্বকে সংস্কার করে রামমোহন রায়ের 'বেদান্ত প্রতিপাদিত ধর্ম' (ব্রাহ্মধর্ম) বাংলার নতুনত্বের আন্দোলন আনে। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস বাংলায় ব্যাপক আলোড়ন তুলেছিল।

বিশ শতকে সেই রকম সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন হয়নি বা কেউ নতুন কিছু করতে উদ্যোগী হননি। উনিশ শতকের আটের দশকে ভারতে জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত ও জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা বাংলা তথা ভারতবর্ষে নতুনের ইঙ্গিত আনে। তারপর ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন,

কলকাতা থেকে ১৯১১ সালে রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তর, ১৯১৪ এবং ১৯৩৯-৪৫ সালে দুটি বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশভাগ প্রভৃতি ঘটনা বাংলার জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। কিন্তু এরই মধ্যে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা ব্যাহত হলেও চলছিল।

বঙ্গভঙ্গ রোধ ও রাজধানী স্থানান্তর বাঙালির জীবনে নতুন বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের জেরে দুই বাংলাকে এক করে দেওয়া হল। কিন্তু রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হল। ফলে কলকাতার গুরুত্ব কমতে শুরু করল। তরুণ সমাজ চাকরিবাকরি প্রভৃতি বিষয়ে হতাশ হল। তারপর দুই বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ভারতবর্ষ তথা বাংলার কণ্ঠরোধ হল। কিন্তু সাহিত্যচর্চা চলতে থাকল। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেলেন। রবীন্দ্র সাহিত্যের ধারা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলল। এদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে উঠতি তরুণ লেখকের দল মাথা তুলতে না পারায় তাদের মনে ক্ষোভের জন্ম হল। রবীন্দ্রবিরোধী গোষ্ঠী তৈরি হল। তারা সরাসরি রবীন্দ্র-বিরোধিতায় নেমে পড়ল। তারা 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশ করল। ইউরোপীয় নতুন চিন্তাধারা, ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্ব, হ্যাবলক এলিসের যৌনমনস্তত্ত্ব বাংলার নতুন কবি-সাহিত্যকদের উৎসাহিত করেছিল তাই তাঁরা রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও নীতিবাদের বিরুদ্ধে নতুন চিন্তা ভাবনা নিয়ে নেমে পড়েছিলেন। এঁরা হলেন গোকুল নাগ, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকগণ।

এদিকে রবীন্দ্র-বিরোধিতা না করেও আর একদল সাহিত্যিক নিজের মত করে সাহিত্য চর্চা করতে লাগলেন। তাঁরা হলেন জীবনানন্দ দাশ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে বাংলায় মনুষ্যকৃত মন্বন্তর বা দুর্ভিক্ষের (১৯৪৩, বাংলা ১৩৫০) বা পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে খ্যাত, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিজন ভট্টাচার্য 'নবান্ন' (১৯৪০) লিখে নাট্যসাহিত্যে নতুন দিগন্তের সূচনা করলেন। এই বন্যা প্রাকৃতিক কারণে হয়নি অর্থাৎ অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, খরা-বন্যার জন্য হয়নি। ব্রিটিশ সরকার সৈন্যদের জন্য রসদ সংগ্রহ করতে গিয়ে বাংলাকে অন্নহীন করে তুলেছিল, যাতে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক মারা যায়।

এই অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা, দুর্ভিক্ষের মধ্যেও বাঙালি শিল্প সংস্কৃতির চর্চা বিরত থাকেনি। চলচ্চিত্র নামক নতুন শিল্পকলায় তাদের আগ্রহ দেখা গেল। মঞ্চাভিনয়ের পাশাপাশি চলচ্চিত্রের আবির্ভাব শিল্প সংস্কৃতির জগতে যুগান্তর আনল। চার্লি চ্যাপলিনের 'দি গোল্ড রাস' (১৯২৫) দিয়ে কাহিনীচিত্রের প্রসাদ, যদিও তা ছিল নির্বাক। ডেনমার্কের কার্ল ড্রাইয়র 'দি প্যাসন অফ্ জোয়ান আর্ক' (১৯২৯ সালে) ছবিতে নির্বাক যুগের পরাকাষ্ঠা দেখালেন। ভারতে, দাদা সাহেব ফালকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক রূপে অভিহিত। তবে বিতর্ক আছে। 'ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাস' গ্রন্থে কালীশ মুখোপাধ্যায় তথ্য দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, বাংলার হীরালাল সেনই প্রকৃতপক্ষে এদেশীয় চলচ্চিত্রের জনক। পরবর্তী ১০ বছর ফাল্‌কে আরও বহু চিত্র নির্মাণ করেন। ১৯২৯-৩০ সালে সবাক চলচ্চিত্রের আবির্ভাব। ফালকের প্রথম চিত্র হরিশ্চন্দ্র (১৯১৩)। আর্দেশীর ইরানীকৃত প্রথম হিন্দি সবাকচিত্র 'আলম আরা' ১৯৩১ সালে ১৪ মার্চ মুক্তি পায়। ঐ বছরই তিনটি বাংলা ছবিও মুক্তি পায়। প্রমথেশ বড়ুয়ার 'দেবদাস' সারা ভারতে

(হিন্দি ও বাংলায়) জনপ্রিয় হয়। ১৯৫৫-তে ‘‘পথের পাঁচালী’’ সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় প্রকাশিত হলে বাংলা চলচ্চিত্র জগতের নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। [‘‘চলচ্চিত্র’’, চিদানন্দ দাশগুপ্ত এবং ‘‘চলচ্চিত্র ভারতে২২—মহেন্দ্রনাথ সরকার। দ্র. ভারতকোষ-৩য় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। পৃ. ৩০২-৭]

বাঙালির এইসব শিল্প সংস্কৃতি চর্চা সংক্ষেপে বলা সম্ভব নয়। আলোচ্য পরিসরে সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া গেল।

১৪.৪ সারাংশ

বিশ শতকের বাংলার সমাজ সংস্কৃতির পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া হল। দীর্ঘ একশো বছরের পরিচয় এত সংক্ষেপে বলা সম্ভব নয়। আমাদের বর্তমান আলোচনায় দেশভাগ সম্পর্কিত আলোচনা উহ্য রাখা হয়েছে, কারণ পরবর্তী এককে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ আছে।

একক ১৫ ❑ মন্বন্তর, পার্টিশন, ভূমি সংস্কার

গঠন

১৫.১ উদ্দেশ্য

১৫.২ প্রস্তাবনা

১৫.৩ মন্বন্তর বা দুর্ভিক্ষ

১৫.৪ 'পার্টিশন' শব্দের ব্যাখ্যান ও দেশ ভাগের প্রসঙ্গ

১৫.৫ জাতীয়তাবাদ ও অস্তিত্বের সংকট : ১৯৪৭-এর দেশ বিভাজন

১৫.৬ দেশভাগ ও সাহিত্যিক আখ্যান

১৫.১ উদ্দেশ্য

বিশ শতকের বাংলায় রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবন বিপর্যস্ত নানান ঘটনায়। দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, নকশাল আন্দোলন প্রভৃতি সমস্যায় জনজীবন বিভ্রান্ত। তারই কিছু পরিচয় দেওয়াই এই এককের উদ্দেশ্য।

১৫.২ প্রস্তাবনা

বিশ শতকে বিপর্যস্ত বাঙালির পরিচয় দেওয়া এই পর্যায়ের বিশেষত্ব। মন্বন্তর, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, নকশাল আন্দোলন, ভূমিসংস্কার, বিশ্বায়ন প্রভৃতি নানান অভিঘাতে বিপর্যস্ত ও বিভ্রান্ত বাঙালি। সেই সমস্ত ঘটনার প্রতিটির পৃথকভাবে আলোচনা না করে এই এককে একসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

১৫.৩ মন্বন্তর বা দুর্ভিক্ষ

বিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলায় মন্বন্তর বা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যা বাঙালিকে চরম দুর্দশার মধ্যে ফেলে দেয়। ১৯৪৩ খ্রি. (বাংলা ১৩৫০ বঙ্গাব্দ) এই মন্বন্তরা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে বাংলা। ১৩৫০ সালের এই দুর্ভিক্ষ 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে খ্যাত। মন্বন্তর শব্দটির পৌরাণিক অর্থ এখানে আলোচনা করছি না। তবে 'মন্বন্তর'-এর অর্থ কোনো কারণে মানব সমাজ বা জীবনের ঘটনা। সাধারণত অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশে খাদ্যের সমস্যা দেখা দেয়। ভিক্ষাও পাওয়া যায় না, তাই দুর্ভিক্ষ। পঞ্চাশের মন্বন্তর প্রাকৃতিক কারণে ঘটেনি, এটিকে manmade বা মনুষ্যকৃত দুর্ভিক্ষ বলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সৈন্যদের রসদের প্রয়োজনে সারা বাংলার খাদ্যসামগ্রী তুলে নেয় ব্রিটিশ সরকার। ফলে দেশে কৃত্রিম খাদ্য সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং অসংখ্য প্রাণহানি ঘটে। 'ভারতকোষ' গ্রন্থে লেখা

হয়েছে—''লোক ক্ষয়কর দুর্ভিক্ষের পুনরাবির্ভাব ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষে বাংলা প্রদেশে ১৫ লক্ষ (মতান্তরে ৩৫ লক্ষ) লোকের প্রাণহানি ঘটে। প্রধানত মানবিক কারণে এই দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল।''—অমৃতানন্দ দাস।'' (ভারতকোষ, ৪র্থ খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ. ৭৫-৭৬ দ্র.)।

একই সময়ে অন্যদিকে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছিল, তারপর দেশ স্বাধীন হল, দেশ খণ্ডিত হল। সেই দেশ ভাগ বা পার্টিশন ও তার প্রতিক্রিয়া বাঙালিদের যে যন্ত্রণার মধ্যে ফেলেছে তা সহজে বলা সম্ভব নয়। দেশ ভাগ ও তার প্রতিক্রিয়ার কিছুটা পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। [এ বিষয়ে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা চলছে।]

১৫.৪ 'পার্টিশন' শব্দের ব্যাখ্যান ও দেশ ভাগের প্রসঙ্গ ঃ

ইংরেজি 'partition' (পার্টিশন/পার্টিশান) শব্দটি দুভাবে ব্যবহৃত হয় অথবা বলা ভালো দুটি অর্থকে জানায়। যেমন,

১. একটা জায়গাকে ভাগ করার জন্য কিছু গড়া যেমন হালকা অন্তবর্তী দেওয়াল যা এক জায়গাকে বিভক্ত করে দেয়।

২. অংশে বিভক্ত করা যেমন রাজনীতিশাস্ত্রে বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একটি দেশকে/রাষ্ট্রকে কতকগুলো ভাগ বা অংশে বিভক্ত করা। যেমন—পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, ভারতের প্রথমে দুটি অঙ্গচ্ছেদ—পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান (= বর্তমানে পাকিস্থান), পরে পূর্ব পাকিস্থান থেকে বাংলাদেশ।

ভৌগোলিক ভাবেও এই বিভাগ দেখতে পাই—উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকা, উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে পার্টিশন বা বিভাগ যতটা রাজনৈতিকভাবে ব্যাখ্যাযোগ্য, ততটা ভৌগোলিক অঞ্চলরূপে নয়। লাতিন 'paritor' থেকে (যার অর্থ বিভক্ত করা) ইংরেজি 'partition' এসেছে।

এরপর ভারতবর্ষ দুটি খণ্ডে বিভক্ত হলে ঐ পার্টিশন, উদ্বাস্তু, দেশত্যাগী, শত্রুসম্পত্তি, সম্পত্তি হস্তান্তর—এসব শব্দ প্রচলিত হতে থাকে। এখানে আমাদের দেশ ভাগের ইতিহাসটুকু আবার ফিরে দেখা দরকার।

ভারতবর্ষের ভাগাভাগি (partition) ছিল ট্র্যাজিক। অনেকগুলি বৈপরীত্য এখানে যোগ দিয়েছিল। ১৯৪০ অবধি যে মুসলিম লীগের সামাজিক সমর্থন ছিল না তারা আন্দোলন গড়ে তুলে ভারতকে অঙ্গহীন করে তুলল। জিন্না যিনি ১৯৩০ অবধি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী ছিলেন পাকিস্থান দাবির মুখপাত্র হলেন। দশক ধরে যারা জাতীয় ঐক্যের জন্য লড়ছিল, সেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অস্বস্তির মধ্যে পাকিস্থান গঠনের প্রস্তাব মেনে নিল।

দুই জাতি তত্ত্ব (Two-nation theory) হিন্দু মুসলমানের যৌক্তিক এবং অনিবার্য ফল হল দেশভাগ। সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে দুই জাতি রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত হল। ১৯৪০ লাহোর সম্মেলনে লীগের প্রস্তাব ছিল স্বাধীন স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র চাওয়া হল। জিন্না দেশ ভাগের জন্য জোর দিলেন।

নিজেদের প্রাদেশিক অস্তিত্ব রক্ষার (provincial identity), সামাজিক সংহতি (social mobilization), সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বিভিন্ন প্রদেশে দেখা দিয়েছিল।

এই দেশ ভাগকে উঁচু দরের রাজনীতি বলে অনেকে মনে করেছেন। বাধ্যতা ও পরস্পর বিরোধিতা মুসলিম লীগের মূলধন ছিল। প্রদেশগুলির কোনো চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রে রূপান্তর হল না। ফলে বিভিন্ন প্রদেশে লাহোর সম্মেলনের পক্ষে-বিপক্ষে মতামত, আন্দোলন গড়ে উঠল।

শেষাবধি ভারতের দুটি রাষ্ট্রের পত্তন হল—ভারত ও পাকিস্থান। ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেশভাগের প্রভাব পড়ল পঞ্জাব ও বাংলায়। এছাড়া সিন্ধু আদি অন্যান্য অংশ পশ্চিম পাকিস্থানে গেল। পূর্ব বাংলায় মুসলিম সংখ্যাধিক্য বলে সেটি পূর্ব পাকিস্থান নামে চিহ্নিত হল। অর্থাৎ ভারতবর্ষ তিনটি অংশে ভাগ হয়ে গেল—ভারত, পূর্ব পাকিস্থান ও পশ্চিম পাকিস্থান। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্থানকে নিয়ন্ত্রণ করত পশ্চিম পাকিস্থান। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে পূর্ব পাকিস্থানে বাংলাদেশ কায়েম হলে তা পাকিস্থানী শাসন থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

আমরা এখানে পঞ্জাবের বা অন্য প্রদেশগুলির ভাগাভাগি নিয়ে কথা না বললেও বাংলার দেশভাগ নিয়ে কিছু প্রশ্ন আলোচনা করব। সেখানে ১৯২০-৪৭ পর্যন্ত বাংলা রাজনীতি ও মুসলমান জনগণের সম্পর্ক বিশ্লেষিত হবে। আবার জাতীয়তাবাদ, অস্তিত্বের সংকটও ১৯৪৭ দেশভাগের পর কি চেহারা নিয়েছিল, তাও বিধৃত হবে। এর মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক চালচিত্র ফুটে উঠবে, বাংলা সাহিত্য কতখানি দেশভাগে ভিত্তি করে কতটা বিষয় আঙ্গিকে আলাদা হয়েছিল, তা স্পষ্ট হবে। আসলে দেশভাগ সাহিত্যে লেখকমনকে কত কী প্রশ্নের সামনে ফেলে, তিনি এর কোন দিকটায় উৎসাহ দেখান, তা আমাদের অনুসন্ধেয় বস্তু হবে। আমরা দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি জাতীয়তাবাদ ও অস্তিত্বের সংকট প্রথমে আলোচনা করে নিচ্ছি।

১৫.৫ জাতীয়তাবাদ ও অস্তিত্বের সংকট : ১৯৪৭-এর দেশ বিভাজন

পূর্ব পাকিস্থানের মানুষদের মৌলিক সমস্যা ছিল অস্তিত্বের পুনঃসংজ্ঞা দানে তাদের ঐতিহ্য কী এ নিয়ে সমস্যা এসেছিল। পাকিস্থান, পশ্চিমবঙ্গের এবং সারা মুসলিম জগতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিচার করা হচ্ছিল।

রাষ্ট্র গঠন, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সমাবেশ, জাতীয় অস্তিত্ব কতকগুলি জটিল প্রশ্নের সামনে হাজির করছিল। 'মুসলিম হিন্দু ভারতীয় পাকিস্থানী' ব্যাখ্যাযোগ্য হয়ে উঠছিল। এখানে একটা অস্তিত্বের বহুমুখী মত জড়িত ছিল। ১৯১২ থেকে ১৯৪৭ অবধি যারা এখানে বাংলা বলত, অর্থনৈতিক কাজকর্মে যুক্ত হত রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ জাতীয়তাবোধে নতুন বাছাই (choice) শুরু করল। মানুষ সংকটের সময়ে যা পছন্দ করে বা নির্বাচন করে, পরে তা অন্য পছন্দে পালটে যায়।

এখানে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে কয়েকটা ধারণার পরিচয় নিতে হবে। অনেকে দেখেছেন লেখকেরা দেখেছেন ১৯৪৭ অবধি সহযোগিতা ও মৈত্রী এ সময়ে হারিয়ে যাচ্ছিল। তাঁদের কাছে ১৯৩০ বা ১৯৪০-এর মানুষের স্বাধীন বাছাই (free choices) ছিল না। যেমন রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century (1960) গ্রন্থে লিখেছেন :

"A fundamental and basic difference between the two communities was apparent even to a casual observer. Religious and Social ideas and institutions counted for more in men's lives in those days than anything else, and in those two respects the two differed as poles asunder....The literary and intellectual tradition of the two communities ran on entirely different lines, and they were educated in different institutions, Tols and Madrasas... It is a strange phenomenon that although the Muslims and Hindus had lived together in Bengal for nearly six hundred years, The average people of each community knew so little of the other's traditions."

রমেশচন্দ্র মজুমদার আরও বলেছিলেন যে, বিশ্বাস ও কুসংস্কার সমানভাবে তাদের থাকলেও তারা জলবিভাজিকার দুটো আলাদা কক্ষের মতো বিভক্ত ছিল।

প্রশ্ন ওঠে ১৯৪৭-এর আগে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের সমর্থকদের সংগঠিত করতেন কিভাবে এবং অস্তিত্বের রূপায়ণ কী করে হত? সেখানে কি ধর্মীয় আনুগত্যই বড়ো হয়েছিল?

কিন্তু ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু হলেও, হিন্দু মুসলিমের একত্রীকরণের একটা প্রক্রিয়া দানা বাঁধলেও ১৯০৭, ১৯২০ বা ৩০ নাগাদ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছিল। ১৯০৭ এবং ১৯৩৬-এ মুসলিম লীগ ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯৪৭ সালে নিজেদের সমর্থন চেয়েছিল। অনেকেই বলেছেন ১৯০৭-এর দাঙ্গা সাম্প্রদায়িক সম্পর্কে প্রভাব ফেলেছিল।

দ্বিজাতিতত্ত্ব নিয়ে মহম্মদ জিন্না রমেশচন্দ্র মজুমদাররা যতই বলুন না কেন, একে অনুমান করা যায় না। হিন্দু মুসলিম সহযোগিতার আড়ালে প্রচ্ছন্ন বিরূপতা শোষণ এবং বিরোধ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে ভাগাভাগি সাম্প্রদায়িক অস্তিত্ব নির্ভর করত না।

বাংলায় ভারতীয় জাতীয়তার আন্দোলনে, ঊনিশ শতকের শেষে, উঁচুজাতের হিন্দুদের আধিপত্য ছিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যরা উঁচুপদে আসীন ছিলেন। এরাই সাংস্কৃতিক জগতে দখলদারি দিতেন।

অন্যদিকে মুসলিমরা বাংলায় শিক্ষা, পেশা এবং সরকারি চাকরিতে পিছিয়েছিল। এরা মূলত নীচু শ্রেণীর চাষি যারা পূর্ব বাংলায় বসবাস করত। হিন্দুদের জমির প্রজা ছিল এবং হিন্দু মহাজনদের কাছে টাকা ধার নিত। পশ্চিমা শিক্ষা পেতে এদের দেরি হয়েছিল। আঞ্চলিক ও জাতীয় রাজনীতিতে উৎসাহীরাও কংগ্রেসের থেকে দূরে থাকতেন।

প্রজা আন্দোলন

খিলাফৎ আন্দোলনের সময় প্রজা বিক্ষোভ এক নতুন মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ছিল। ১৯১৪-য় ময়মনসিংহের জামালপুরে ফজলুল হক, আক্রম খান, আবুল কাশেম, কামিরুজ্জামান ইসলামাবাদী,

রাজিবুদ্দিন তরফদারের মতো প্রাদেশিক নেতাদের উপস্থিতিতে কামারীরচর প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। জমির হস্তান্তর, জমির বকেয়া, খাজনা হ্রাস, গাছের ওপর প্রজার অধিকার, বেআইনী আদায়—এ সবের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ উঠেছিল। এদের সঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাশের কলকাতার অনুগামী মুসলিম নেতাদের সম্পর্ক ছিল।

১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হলে ১৯২৬-২৭-এ ব্যাপক জাতিদাঙ্গা অনুষ্ঠিত হল। ১৯২৮ সালে বাংলা ভাড়াটিয়া আইনের সংশোধনে কংগ্রেস হিন্দু মুসলিম মুক্তি খারিজ করল। বহু মুসলিম নেতা কংগ্রেস ছাড়লেন। কংগ্রেসরা জমিদারদের সপক্ষে থাকলেন, মুসলিম সদস্যরা প্রজাদের অধিকারের পক্ষে রইলেন। এরকম বলা হল, 'Neither in terms of the Muslim interest, nor of the Parja interest, was it possible any longer to rely on the Congress''. (আমার দেশের রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা, ১৯৭০, আবুল মনসুর আহমেদ)।

১৯৩০-৩২ আইন অমান্য আন্দোলনে খুব সামান্য মুসলমানই অংশ নিয়েছিল। প্রজা সমিতি সিদ্ধান্ত নিল সরকারি সংস্থায়, আইনসভা, পৌরসংস্থা ও ইউনিয়ন বোর্ডে অংশগ্রহণ করবে। ১৯৩০-৩৪ প্রজা সমিতি কলকাতার মুসলিম বুদ্ধিজীবী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। ১৯৩৫-এ ফজলুল হক মোমেনকে হারিয়ে সভাপতি হলেন। কৃষক প্রজা সমিতি হয়ে উঠল 'পুরোপুরি একটি পূর্ব বাংলার দল।'

১৯৩৬-এ প্রজা আন্দোলন চরমে পৌঁছল। পটুয়াখালির নির্বাচনে ফজলুল হক পশ্চিমাপন্থী (westernized aristo antic leadership) খাজা নিজামুদ্দিনকে হারালেন। প্রজা সমিতি মন্ত্রী সভা গঠনে কংগ্রেসের সাহায্য চাইল। ফজলুল হক মুসলিম লিগের সঙ্গে একটা সম্মিলিত মন্ত্রীসভা (coalition ministry) গঠন করলেন। কৃষক প্রজা সমিতির (KPP) উদারপন্থীদের একটা বড়ো অসন্তোষ হল যে মন্ত্রীসভার গঠন হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও বাংলা জমিদারী ব্যবস্থা মেনে নিয়ে। সরকারি বিভাগের দলিলপত্রে দেখা যায় যে একটা ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র পুরোনো স্বার্থের তল্‌পি বহন করেছিল।

মুসলিম লীগের প্রতি ঝোঁক

১৯৪৩-এ ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভার পতন হল নিজামুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের সরকার এল। ফজলুল হকের কৃষক প্রজা সমিতির ব্যর্থতায় মুসলিম লিগের প্রতি মানুষের ঝোঁক বাড়ল। মুসলিম ধনী চাষিরা রাজনৈতিক কার্যক্রমের সুনিশ্চিত ধারণা গড়ল। সরকার তাদের সমর্থন করল। সুবারর্দীর সময়ে মুসলিম লীগ পাকিস্থান আন্দোলন বিস্তার করল শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে। ১৯৪৪-এ আবুল হালিম লীগের সম্পাদক হয়ে এর সাংগঠনিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কৃষক জনতা ও সংগঠিত দলীয় নেতৃত্বের একটা সংযোগ ঘটল। ১৯৪৩ বেশির ভাগ মুসলিম জোতদাররা কৃষক প্রজা সমিতি ছেড়ে মুসলিম লীগে যোগ দিল। বাকি সামান্য কিছু কৃষক প্রজা সমিতির সদস্য কম্যুনিস্টদের সঙ্গে যোগ ছিল। এভাবে কৃষক প্রজা সমিতি ভেঙে গেল। এর ইতিহাস এখনও গুছিয়ে লেখা হয়নি।

মুসলিম জনতারা কি কোনো আদর্শগত পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়েছিল? এই সমস্যাটা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কিংবদন্তীর সূর্য' গল্পে ধরা পড়েছে।

ফেলু শেখ প্রজাদের একটা সভা ভাঙার জন্য জমিদারের অত্যাচারে একটা হাত খুইয়েছিল। এক নারী কাঁকড়া ধরতে গিয়ে হ্রদের জলে ডুবে গেল। গ্রামবাসীরা তাকে কবর দিচ্ছে। ফেলুর হাতে দেখা গেল দুটি ছাপানো ইস্তাহার যাতে লেখা 'আমরা লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান। সে কবরের মৃতদেহের ওপর ঐ দুটো রাখল। মুসলিম লিগের স্থানীয় নেতা হল শামসুদ্দিন। ফেলু ভাবল ভাঙা হাতে আমি আর কি করব। কিন্তু সে ভাবল দৌড়ে গিয়ে দশটা মড়া এনে শামুর পায়ে এনে বলবে, এই দ্যাখ মিঞা এগুলো নাও। আমি তোমার জন্য এনেছি। এখন দেশটারে ভাগ করো।' এভাবে খিলাফৎ থেকে পাকিস্থান অবধি সংগঠিত রাজনীতির নানা চেহারা দেখতে পাই।

জাতীয়তাবাদ ও অস্তিত্ব : ১৯৪৭ দেশভাগ

২০ জুন, ১৯৪৭ পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার আইনসভার যৌথ অধিবেশনে ভারতে থাকার পক্ষে ৯০টি এবং নতুন আইনসভা বা পাকিস্থানের পক্ষে ১২৬টি ভোট পড়ল। কম্যুনিস্ট নেতারা ভোট দানে বিরত থাকলেন। অ-মুসলিম প্রধান এলাকার একটি সভায় ভোট হল ৫৮ ও ২১। দেশভাগের পক্ষে এবারে কম্যুনিস্ট নেতারাও সায় দিলেন। তবু কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার জোট পশ্চিমবাংলাকে হিন্দু প্রধান প্রদেশ হিসাবে প্রমাণ করল। কিন্তু পাকিস্থান থেকে আলাদা সংযুক্ত বাংলা কারোরই পছন্দ ছিল না। সতীশ বোস (শরৎ বোসের ভাই) ও কিরণশঙ্কর রায় বিভাজনের পক্ষে মত দিলেন। জিন্না 'মথ-খাওয়া' পাকিস্থান পেলেন পশ্চিমবাংলা ও পূর্ব পাঞ্জাব ছাড়া। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী হলেন। একটা সীমানা কমিশন ঐ ভাগাভাগির জন্য নির্দিষ্ট হল। সাম্প্রদায়িক ও অস্তিত্বের সংকটকে এই দেশভাগ ও পরে ১৯৭১-এর বাংলাদেশ গঠন নিরসন করল না। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতাদের দেওয়া দুই দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা অসার হয়ে দাঁড়াল। সংখ্যাগুরুর নিশ্চিত লক্ষ্য এবং সরকারের চেষ্টা এই শান্তি স্থাপনে সহায়ক হত। ইন্দো-বাংলাদেশ এবং হিন্দু মুসলিম উৎসাহ কমে এল এবং সন্দেহ বাড়ল।

পশ্চিম বাংলার হিন্দু বাঙালিরা তাদের অস্তিত্ব এবং পরম্পরা সম্পর্কে সচেতন। তারা হিন্দু বাঙালি এবং ভারতীয়। পশ্চিম বাংলায় মুসলমানরা বাঙালি, ভারতীয় এবং মুসলিম।

হিন্দু মুসলিম নির্বিচারে সমস্ত বাঙালির (বাংলাদেশে বা ভারতে) একাধিক অস্তিত্ব আছে। বাঙালির সংযুক্ত বাংলা ১৯৭১-এর বিকল্প ছিল না। বাঙালিরাও পশ্চিমবাংলার জন্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে বাংলা যুক্তরাষ্ট্রের (Bengali Republic) পত্তন চাইতেন না। বাংলা ও বাঙালির এরকম উত্তরহীন প্রশ্ন দুটি প্রজন্ম ধরে বয়ে গিয়েছে। একটা হল বাইরের শক্তি বাঙালিকে এভাবে পরিণত করে নি যাতে সে অজানা দিকে নিজেকে নিয়ে যেতে পারে। বাইরের শক্তি মানে ব্রিটিশ রাজের রাজনৈতিক শক্তিসমূহ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সহযোগিতাকে বারেবারে বিপদগ্রস্ত করেছে। আমরা জানি না এই ঘটনাপ্রবাহ অন্যরকম হত কিনা যদি বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বেশি হত। কিন্তু আমরা জানি যে ঐসব শক্তি বাঙালির রাজনৈতিক ভাবনার উন্নতির জন্য বড়ো রাজনৈতিক প্রথাকে আশ্রয় করেছিল।

আরেকটি প্রশ্ন হল ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির ভূমিকা যা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপাদানের

বিপরীতে স্থিত। বলা হচ্ছে ধর্ম হল চিহ্ন/মুখোশ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের রক্ষাকবচ মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা ধর্মীয় ভাবনাকে রাজনীতিকরণের হাতিয়ার। হিন্দু মধ্যবিত্ত বা মুসলিম মধ্যবিত্ত (বাংলাদেশে) রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থকে সংরক্ষণ করেছে। এখানে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বার্থ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উপাদান ও স্বার্থ একসঙ্গে সক্রিয় থাকে। সংকটকালে নিজেদের আরক্ত বন্ধনে বাঁধে। কিন্তু যদি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উপাদানকে খারিজ করি, তাহলে ব্যাখ্যা করতে হবে পূর্ববাংলার হিন্দুর দেশবিভাগ চিন্তা এবং পশ্চিমবাংলার মুসলমান অধিবাসীদের পাকিস্থান ভাবনা। বাঙালি অস্তিত্ব ও সামাজিক ভাবনাকে একটা তন্তুজাল হিসাবে দেখলে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের পারস্পরিক সহিষ্ণুতা বেশ কষ্টকর অবস্থায় চলেছে।

১৫.৬ দেশভাগ ও সাহিত্যিক আখ্যান

বাঙালির জীবনে ঘটে যাওয়া এই দেশভাগ সে সময় যেমন একটা জ্বলন্ত রাজনৈতিক প্রশ্ন ছিল, তেমনি তা বাঙালির মন-মনন-সারস্বত চিন্তায় স্বাভাবিকভাবেই ছাপ ফেলেছে। দেশ বিভাগের প্রতিক্রিয়া সূক্ষ্ম আকার ধারণ করে এখনও যে আমাদের পীড়িত করে না এটা বলা যায় না। এখনও সেই পুরোনো উদ্বাস্তু সমস্যার কোনো সুরাহা হয়নি। বর্তমানের বাংলাদেশ ১৯৭১ পর্যন্ত ছিল পাকিস্থানের অধীন। তার সেই টিকে থাকার সংগ্রাম সেখানে রাজনীতির জটিল মিশ্র পাক তৈরি করেছে। সাহিত্যে এগুলির ছাপ পড়া স্বাভাবিক। আমরা এখানে কবিতা-ছোটগল্পের তুলনায় উপন্যাস বা আখ্যানের দেশ বিভাগীয় বৈচিত্র্য আলোচনায় বেশি উৎসাহী। কারণ জীবনের অনেক বেশি অংশ ধারণ ও ব্যাখ্যান করে এই উপন্যাসের জগৎ।

কবি ও কবিতা

দেশভাগের মর্মান্তিক পরিণতি বিষ্ণু দে চমৎকারভাবে দেখিয়েছিলেন ‘জল দাও’ কবিতায়—

> এখানে ওখানে দেখ দেশছাড়া লোক ছায়ায়-হাঁপায়
> পার্কের ধারে শানে পথে গাড়ি বারান্দায়
> ভাবে ওরা কি ভাবে! ছেড়ে খোঁজে দেশ
> এইখানে কেউ বরিশালে কেউ কেউ বা ঢাকায়

কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের (১৯২৬-৪৭) স্বাধীন ভারতবর্ষকে দু'চোখ ভরে দেখার ঠিক সৌভাগ্য হয়নি। মাত্র একুশ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি যে প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন তা বিস্ময়কর। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণাই তাঁর কবিতার মূল সুর। অনেকেই তাঁর মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অকাল মৃত্যু সেই সম্ভাবনায় ছেদচিহ্ন টেনে দেয়। ‘ছাড়পত্র’, ‘পূর্বাভাষ’, ‘ঘুম নেই’ তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। সমাজতন্ত্রের জন্য স্বপ্ন এবং ব্যক্তিগত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনেক সময়ই তাঁর কবিতায় একাকার হয়ে গেছে।

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-৮৫) বয়সে সুকান্তের চেয়ে প্রবীণ। কিন্তু তিনিও প্রতিবাদী। সে প্রতিবাদ ধনবাদী সভ্যতার শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে। এই সভ্যতা মানুষের ভেতরে ভেতরে যে গ্লানি

আর বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়, কবি তার কথাও অবিশ্রান্ত বলেছেন। তাঁর 'নির্বাচিত কবিতা'র সম্পাদক তাঁর সম্পর্কে যা বলেছেন, তা এই ক্ষেত্রে প্রকৃতই প্রণিধানযোগ্য : "'উলুখড়ের কবিতা', 'মৃত্যুত্তীর্ণ', 'লখিন্দর' কিংবা 'জাতকে'র ব্যাপ্তি জুড়েও কবি 'রাণু-র জন্য'তে যেমন, অনেক সময়েই মধ্যবিত্ত বিচ্ছিন্নতাবোধও তার অস্থির দহনে বিপর্যস্ত। কখনও আবার সীমাহীন নিরাসক্তি ও ক্লান্তির অবসাদে অসহায়, পর্যুদস্ত।...উল্লেখ করা প্রয়োজন, নৈর্ব্যক্তিক ও নীরক্ত যেমন নয়, এই মানবতাবাদ, তেমনি তা পক্ষপাতহীনও নয়। তাই তাঁর কবিতা ভ্রষ্টাচার শাসনের প্রতিবাদে, ভণ্ড নেতা-কবি-সাংবাদিককুলের মুখোশ উন্মোচন তীক্ষ্ণ কণ্ঠ, শ্লেষাত্মক ও নির্মম। অন্যদিকে সাধারণ, উৎপীড়িত, সংগ্রামী-শ্রমজীবী মানুষের প্রতি গভীর মমতায় ভালোবাসায় তাঁর কবিতা নম্র ও স্নিগ্ধ।" শ্লোগান থাকলেও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাই শেষ পর্যন্ত কবিত্বের সিদ্ধিতে পৌঁছেছেন অনায়াসে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-৯৫) এই পর্বের এক অদ্ভুত নিয়ম শাসন না-মানা কবি। 'অস্ফুট যৌবন' (১৯৫২) তাঁর প্রথম কবিতা। তাঁর কবিতা-কাব্যকে তিনি 'পদ্য' বলতে পছন্দ করতেন। 'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব?' 'ছবি আঁকে, ছিঁড়ে ফেলে', 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো', 'অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকার', 'চতুর্দশপদী কবিতাবলি', 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান', 'উড়ন্ত সিংহাসন', 'সোনার মাছি খুন করেছি', 'প্রভু নষ্ট হয়ে যাই', 'কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে' তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য। সমস্ত পুরনো মূল্যবোধকে চূর্ণ করতে চাইলেও শেষে কিন্তু জীবনসায়াহ্নে শক্তি রবীন্দ্রনাথেই তাঁর আশ্রয় খুঁজে পান। শক্তি এও বলেছিলেন, পশ্চিমী ধরনের 'হাংরি' নন তিনি, তিনি স্পষ্টতই দরিদ্র দেশের একজন 'ক্ষুধার্ত'। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪) কবিতাও পাঠক-চিত্ত জয়ে সিদ্ধি লাভ করেছে। জীবনের দুঃখ বঞ্চনায় কবি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন, প্রতিবাদ করতে চান, কখনও পারেন, কখনও পারেন না, এরই মধ্যে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখে ভালোবাসার স্মৃতি, ভালোবাসার স্বপ্ন। সুনীল মনে প্রাণে একালের অথচ পুরনোর সঙ্গে বিচ্ছেদ নেই। 'একা এবং কয়েকজন' (১৩৬৭), 'আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি' (১৩৭২), 'বন্দী জেগে আছো' (১৩৭৫), 'আমার স্বপ্ন' (১৩৭৯), 'সত্যবদ্ধ অভিমান' (১৩৮০), 'জাগরণ হেমবর্ণ' (১৩৮১), 'মন ভালো নেই' (১৩৮৩), 'এসেছি দৈব পিকনিকে' (১৩৮৪), 'স্বর্গনগরীর চাবি' (১৩৮৭) তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

আধুনিক কবিতা নদীর মতো। কোথাও তার ছেদ নেই। বিপুল বৈচিত্র্য আর সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে সে অগ্রসর হয়ে চলেছে মহাসমুদ্রের দিকে। তার যাত্রাপথ যেন এক অন্তহীনতার প্রতীক।

উপন্যাস ও ছোটগল্প

পটভূমিকাগত যে উত্তরাধিকার কাব্য ও কবিতা বহন করেছে, সেই একই কথা কথাসাহিত্য সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এই সময়ের কয়েকজন বিশিষ্ট কথাকার হলেন—প্রবোধকুমার সান্যাল, সুবোধ ঘোষ, মনোজ বসু, সমরেশ বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর প্রমুখ লেখকবৃন্দ। সকলের সময়সীমা এক নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন পর্বেই এঁদের অনেকের রচনার সূত্রপাত। পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠা শুধু সমকালীন মধ্যবিত্ত জীবনের ক্ষয়, গ্লানি, অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রেম-পরিণয় নয়, সমাজ-রাষ্ট্র এমনকি ভ্রমণেও এসেছে বৈচিত্র্যের স্বাদ। প্রবোধকুমার সান্যালের 'অগ্রগামী' (১৯৩৬), 'তুচ্ছ', 'প্রিয়বান্ধবী', 'বনহংসী' উপন্যাস এবং ছোটগল্প সংকলন 'অবিকল' উল্লেখযোগ্য রচনা। বিশেষ কোনো মতাদর্শের প্রেক্ষিতে নয়, জীবনকে

তিনি একান্তভাবেই তাঁর নিজের দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রবোধকুমার কোনোভাবেই ভাববিলাসী নন।

সুবোধ ঘোষের উপন্যাসের মধ্যে 'তিতাঞ্জলি', 'গঙ্গোত্রী' (১৩৪৭) সময় সচেতন সৃষ্টি—যুদ্ধ, মনবন্তর এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত ৯১৯৪৫)। 'শ্রেয়সী' (১৯৫৭) একটি ক্ষয়িষ্ণু পরিবারের ছবি। আদিম সংস্কারপ্রধান জীবনের ছবি 'শতকিয়া' (১৯৫৮)। এছাড়া আছে তাঁর অসামান্য গল্প সংকলন 'ফেনিল' (১৯৪১), 'পরশুরামের কুঠার', 'শুক্লাভিসার' (১৯৪৪), 'জতুগৃহ' (১৯৫২)। জীবনকে সুবোধ ঘোষ শেষ পর্যন্ত দেখেছেন আশাবাদী দৃষ্টিতে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে আছে 'দ্বীপপুঞ্জ', 'দেহমন' (১৩৫৯), 'দূরভাষিণী' (১৩৫৯)। মধ্যবিত্ত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, গ্লানি-বেদনার ছবি। স্বাধীনতার আগে রচনা শুরু করলেও পরবর্তী পর্বে মনোজ বসু লিখেছেন 'জলজঙ্গল' (১৯৫১), 'বৃষ্টি বৃষ্টি' (১৯৫৭), 'আমার ফাঁসি হল' (১৯৫৯), 'রক্তের বদলে রক্ত' (১৯৫৯), 'মানুষ গড়ার কারিগর' (১৯৫৯), 'রূপবতী' (১৯৬০) এবং 'বন কেটে বসত'-এর মতো উপন্যাস। 'স্বচ্ছন্দগতি ও জীবন পর্যবেক্ষণ শক্তি' তাঁর রচনার সম্পদ। বিমল করের 'দেওয়াল' (১ম, ১৯৫৯, ২য় ১৯৫৮) উপন্যাসে যুদ্ধ কেমন করে আমাদের জীবনকে আলোড়িত, ধ্বংস করেছে তার অনুপুঙ্খ ছবি রয়েছে। সমরেশ বসু লিখেছেন 'বি. টি. রোডের ধারে', 'গঙ্গা' বা 'ছিন্নবাধা'-র মতো উপন্যাস। পরে 'বিবর', 'প্রজাপতি' এবং 'পাতক'-এর মতো বিতর্কিত রচনা। অজস্র লিখেছেন তিনি। 'কালকূট' ছদ্মনামেও অন্যস্বাদের রচনা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। সাহিত্যের ঐতিহাসিকের মতে, 'অসামাজিক অবক্তব্য, রুচিবিরোধী জীবনের নিষিদ্ধ প্রাঙ্গণে পদচারণা করিয়া তরুণ উপন্যাসিকের দল ব্যাপ্তিকে বাদ দিয়া গভীরতার অতলে আত্মগোপন প্রয়াসী...ইঁহাদের ছোটগল্পগুলি সংকীর্ণক্ষেত্রে যতটা সার্থক হইয়াছে, উপন্যাসে ততটা সার্থক হইতে পারে নাই।' (আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

কখনও গল্পে দেখি মানবিক সম্পর্কের চিরায়ত সূত্রগুলি----বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'কলকাতা-নোয়াখালি- বিহার'। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'গণনায়ক' কিংবা দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটায়ু' গল্পে মানবিক সত্তার এক অপূর্ব উন্মোচন ঘটেছে। সমরেশ বসুর গল্পেও এর সাক্ষ্য আছে। প্রায় প্রত্যেকেই চল্লিশের গাল্পিকেরাও দেশভাগকে কেন্দ্র করে চিরকালের মানবীয় আখ্যান বারবার লিখেছেন। যারা সারাজীবন প্রেমের গল্প লিখবেন বলে শপথ নিয়েছিলেন, সেই নরেন্দ্রনাথ মিত্রও হারানো হিয়ার নিকুঞ্জবনের সুখী প্রহরগুলি চিহ্নিত করেছেন।

অনেক সময় দেশভাগ নিয়ে অনেক প্রশ্ন দ্বিধাজড়িত হয়ে ঘুরছিল। ফলে নবেন্দু ঘোষের 'ফিয়ার্স লেন' (১৯৪৬) অমরেন্দ্র ঘোষের 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে' (১৯৫১) এর মধ্যে একটা চিত্রলেখই পাই। অমিয়ভূষণের 'গড় শ্রীখণ্ড' (১৯৫৭) বা জীবনানন্দের 'জলপাইহাটি' (১৯৪৮)-তে দেশ বিভাগ এসেছে উপকাহিনী হয়ে। তাই সতীনাথ ভাদুড়ীর 'গণনায়ক' (১৯৪৭) কিংবা জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' ছাড়া ঐ কাললগ্নে কোনো সার্থক রচনা দেখি না।

আমরা কয়েকটি বিশেষ উপন্যাসের কথা এবার বলব। যেমন—গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রেম নেই', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব-পশ্চিম' এবং আরও দুয়েকটি উপন্যাস।

যে সময় দেশ ভাগ হয়, সে সময় বাঙালি মনে দেশ ভাগের পটভূমি কিভাবে গড়ে উঠল, তাকেই একটা ঐতিহাসিকতায় গৌরকিশোর ঘোষ 'প্রেম নেই' উপন্যাসে স্পষ্ট করেছেন। সম্প্রদায়গত বিভেদ, সেই মনোযন্ত্রণা, সেই অপ্রেমই এখানে দেখানো হল।

ঔপন্যাসিক কৃষকপ্রজা দলের অবস্থান দেখিয়েছেন কিন্তু সেখানে মানবিক দুর্বলতাগুলি তার লেখচিত্রকে রঞ্জিত করেছে। ফজলুল হকের মতো নেতাকে কোয়ালিশন করতে হয় মুসলিম লীগের সঙ্গে। মুসলমান কীভাবে নিজেদের মুসলিম ঐতিহ্য খুঁজছিল—তাও বুঝতে পারি নিজেদের মুসলিম ঐতিহ্যের এই উত্তরাধিকার খোঁজা ঐতিহাসিকভাবে সত্য হলেও সাধারণ মানুষ একে মানতে পারে নি। গোটা সমাজের কথা ভাবা হল না। মানুষ কিভাবে রাজনীতির বোড়েতে পরিণত হয়, তাই দেখা দিল। উপন্যাসের সমস্যা পট তাই ঐতিহাসিক হয়ে উঠেছে।

এক সময় উপন্যাসের উপসংহারে আসে কংগ্রেস ও প্রজা দলের সম্পর্ক অবনতির কথা। সেখানে ফটিক বিষন্নতায় ভোগে। ছবির সন্তান গর্ভেই বিনষ্ট হয়। সেটা কি ঐ কোয়ালিশনের অপঘাতের চিহ্ন? সাধারণ মুসলমান ও মানুষ কিভাবে সেই সময়কে দেখেছিল, তারই অপূর্ব আখ্যান 'প্রেম নেই।'

প্রফুল্ল রায়ের 'ভাগাভাগি' উপন্যাসে দেশ বিভাগের পরের যন্ত্রণা নয়, তার আগের সময়কেই চিত্রিত করেছেন। দেশ ভাগের মূল অনুসন্ধান তিনি করলেন এই আপাত লঘু উপন্যাসে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসে দুটি দেশ ভাগ আছে। একটি পূর্ব পাকিস্তান, অন্যটি হল বাংলাদেশের জন্ম থেকে ১৯৮০-এর সময়। সমস্ত উপন্যাসে অলক্ষ্য সুতোর মতো দেশ বিভাজনের কষ্টকর প্রসঙ্গ সমস্ত ঘটনাচক্রকে ধারণ করে আছে। এই উপন্যাসে হারীত মণ্ডলের উপাখ্যান হল উদ্বাস্তু সমাজের নেতার ইতিবৃত্ত। তার দুর্দ্দম লড়াই জীবন্ত সজীব হয়ে উঠেছে।

এই সময়কাল; এসব নিয়ে সামাজিক চাপের ওঠানামা সাহিত্যে ছড়িয়েছে তার শাখা-প্রশাখা। পূর্ব-পশ্চিমের প্রথম খণ্ড বেরোয় ১৯৮৮, দ্বিতীয়টি ১৯৮৯। উপন্যাস হিসাবে এটি বিশাল। ১৯৭৮-এ প্রমথনাথ বিশীর 'পনেরই আগস্ট'-এ যে বঙ্গবিভাগ কথা শুরু হয়েছিল, এ তারই অন্য টানে বিস্তার। এখানে রাজনৈতিক সামাজিক জপমালা একই। শুধু তা বিরাট পরিসরে ব্যাপ্ত হতে চেয়েছে। ১৯৯৫-এ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস 'খোয়াব নামা' লিখলেন এই রাজপথ ধরেই।

পঁচিশ বছরের এক কালখণ্ডে অস্থির প্রেক্ষাপট, এক বাঙালি যুবকের পরিবারকে, সমাজকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। পুনঃপ্রতিষ্ঠা কেন! এই অস্থির কালবিন্দুকে ধরে রাখার জন্য স্বদেশী বিদেশি মানুষেরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। উপন্যাস সেগুলিকে কীভাবে ধারণ করবে!

সুনীলের এই উপন্যাসে দেশবিভাজন গাঢ় নীলাঞ্জন ছায়া ফেলেছে। এটা অনেক ভাবে প্রকাশিত। ১. ভারত স্বাধীন হওয়ার পর বিশ্বনাথ গুহকে স্থির করতে হল তিনি কোন দেশের নাগরিক হবেন। তার বাড়ি চলে গেল অন্য দেশে। ২. ভবদেব মজুমদার ভেবেছিলেন দুই বাংলা আবার যুক্ত হবে। চলে যাওয়া হিন্দু সম্পত্তি জলের দরে কিনে মালিকদের ফিরিয়ে দেবেন। ৩. প্রতাপ পিতৃশ্রাদ্ধের সময় মালখানগরে এসে মনে করল যে বাবার মৃত্যুতে সে একেবারে ছিন্নমূল হয়ে গেল। সে কি নির্বাসিতই থাকবে। তার জমিজমা খাস হয়ে গেল। ৪. পূর্ব পাকিস্তান হওয়ার পর ওপারের হিন্দুরা মুসলমানদের

আত্মীয় করে নিল। কিন্তু সত্যি কি নিজেদের সাংস্কৃতিক ব্যবধান মুছে গেল?

পূর্ব-পশ্চিমের 'সূচনা' পর্বের শেষ হয়েছে প্রায় তিনশ দশ পৃষ্ঠা জুড়ে। উপন্যাসে মৌলানা ভাসানী, সুরাবর্দী, মৌলানা আজাদ, হুমায়ুন কবির, আওয়ামি লিগ প্রসঙ্গ এসেছে। দেশ ভাগের পর পঞ্চাশ দশক অবধি এই অংশ চলেছে। বাঙালির জীবন কিভাবে রাজনীতি অর্থনীতির চাপে ছিল, তার একটা ইতিবৃত্ত জানলাম। তথ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে লেখক উপন্যাসের প্রথম খণ্ড শেষ করলেন। কল্পনা, রাজনীতি, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনা স্রোত মিলে মিশে 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের পর্ব তৈরি করল।

আসলে ভারত স্বাধীন হয় ১৯৪৭ সালে। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার জনজীবনে দেখা দিল সুগভীর বিপর্যয়। ভারতের পশ্চিম প্রান্তের পাঞ্জাব এবং পূর্বপ্রান্তের বাংলা দ্বিখণ্ডিত করে দুটি ভাগের নাম দেওয়া হল পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান। বাংলা বিভাগের পরে ভারতভুক্ত অংশের নাম হল পশ্চিমবঙ্গ। পূর্ব পাকিস্তানে বহুকাল ধরে যেসব হিন্দু বাঙালি বাস করতেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তার অভাবে তাঁরা চলে আসতে শুরু করলেন পশ্চিমবঙ্গে। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেল। সেই জনসংখ্যার মধ্যে যেহেতু অধিকাংশই ছিন্নমূল, বাসগৃহহীন, সামাজিক আর্থিক এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিপর্যস্ত—সেই কারণে পশ্চিম বাংলার জনজীবনে, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থানে দেখা দিল বিপন্নতার আলোড়ন। বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পেল। একদা সম্পন্ন গৃহস্থের দল শরণার্থী, অর্থ-ভিক্ষুকে পরিণত হলেন। জীবনের দীর্ঘলালিত মূল্যবোধগুলি সামাজিক সংকটের আঘাতে ভেঙে গেল অথবা পরিবর্তিত হল।

স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিম বাংলার অনেক লেখকই উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে এসেছিলেন। ফলে তাঁদের লেখায় এই জীবনযাপনের সংকট, মূল্যবোধের বিপর্যয়, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, হতাশ, অসহায়, বিপর্যস্ত মানসিকতার প্রকাশ দেখা গেল। পঞ্চাশ ও ষাট দশকের বাংলা উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে এই নৈরাশ্যপীড়িত অসুখী নিরাবলম্বনতার ছবি সুপরিস্ফুট।

সমাজে নারীর অবস্থানে অতি দ্রুত ব্যাপক পরিবর্তন ঘটল বাংলার পূর্ব এবং পশ্চিম উভয় প্রান্তেই। যদিও স্ত্রীশিক্ষা যথেষ্টই বিস্তার লাভ করেছিল চল্লিশের দশকেই, তবুও মেয়েদের গৃহজীবনের বাইরে পদচারণের প্রধান ক্ষেত্রটি ছিল রাজনীতির ক্ষেত্র এবং সমাজসংস্কার। নিছক অর্থনৈতিক প্রয়োজনে, চাকরি করবার উদ্দেশ্য নিয়ে মেয়েরা বাড়ির বাইরে এলেন চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে। ফলে বাঙালির পারিবারিক জীবনে এক বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেল। নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রটি হয়ে উঠতে লাগল অনেকখানি অর্থনৈতিক। স্বাধীনতা-উত্তরকালের বাংলা উপন্যাসে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের দ্বন্দ্বময় পথরেখাটি উৎকীর্ণ।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হলেই তা অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক শৃঙ্খল মোচনের শক্তি জোগায়। ফলত স্বাধীনতা-উত্তরকালের বাংলা উপন্যাসে হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে বিধবাবিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, প্রেমের অধিকার, নারীর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা—ইত্যাদি বিষয় বহুল পরিমাণে স্থান করে নিতে লাগল। আরও একটু এগিয়ে প্রশ্ন তোলা হতে লাগল নারীর চারিত্রিক শুচিতা এবং নৈতিকতা বিষয়ে পিতৃতান্ত্রিক

সমাজের অনুশাসন নিয়েও। সব জড়িয়ে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নারীর সামাজিক ও ব্যক্তিক অবস্থান খুব বড়ো একটি বিষয়।

বাংলা সাহিত্যে সমাজমনস্ক উপন্যাস চিরকালই লেখা হয়েছে, যদিও বিভিন্ন যুগে তার ধরন এরকম নয়। স্বাধীনতা-উত্তর কালের উপন্যাসে সমাজমনস্কতার চেহারাটি বিশেষভাবে সমকালের বাস্তবতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠল। শরণার্থী সমস্যা, মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদি ব্যাপক রূপ পেল উপন্যাসে। সেই সঙ্গে বিংশ শতকের শেষ তিন দশকে, খানিকটা নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রেক্ষিতে উপন্যাসে রাজনৈতিক প্রশাসনকে দেখবার প্রবণতা বৃদ্ধি পেল। বিশেষ করে ১৯৭৭-এর পর পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক প্রশাসনের পরিবর্তন সূচিত হলে বাংলার গ্রামাঞ্চলে ভূমিব্যবস্থা, বর্গা, পঞ্চায়েতি প্রশাসন, দিনমজুরি বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র সমাজে যে পরিবর্তন ঘটল তা বাংলা উপন্যাসেও অনেকখানি বিস্তৃত হল। নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক প্রশাসনের ত্রুটি স্পষ্ট করে দিয়ে লেখা উপন্যাসও আমরা কিছু পেয়েছি।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা চলে। একটি হল সেইসব উপন্যাস যাদের মাধ্যমে লেখক নিজের জীবন-বীক্ষণ, মানব-সমাজ সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধির সত্যতাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে চান তিনি পাঠকের কাছে পৌঁছোতে চান সে কথা সত্য, কিন্তু সে জন্য বিনোদন-পিপাসু সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য গল্প বানাতে চান না। অপর শ্রেণীর উপন্যাস হল আগাগোড়াই সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য পরিকল্পিত রচনা। স্বাধীন ভারতের প্রশাসন ব্যবস্থায় সার্বিক সামাজিক উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য থাকলেও প্রশাসনিক নীতি পুঁজিবাদের প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করেছে। তার ফলে বাণিজ্যিকতার প্রসার এবং বৃহৎ ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রাধান্য এদেশের একটি বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থাও এই সময় প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করল যারা সাহিত্যকে ব্যবসায়িক উপাদান রূপে গ্রহণ ও ব্যবহার করার দিকে মনোযোগী। সাক্ষরতার প্রসারের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের উল্লেখযোগ্য সংখ্যাবৃদ্ধিও ঘটল। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তারও সেই পাঠকশ্রেণী তৈরি করল যারা সাহিত্য থেকে মনোরঞ্জনের উপাদান প্রত্যাশা করে। ফলে পঞ্চাশের দশক থেকেই সেইসব প্রকাশন-সংস্থা এবং সাময়িকপত্র যথেষ্ট বেড়ে উঠল, যেখান থেকে প্রকাশিত হতে লাগল বহু সংখ্যক উপন্যাস, যেখানে লেখকের উদ্দেশ্য প্রধানত মনোরম একটি গল্প নির্মাণ করা।

এই প্রবণতাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সৎ লেখকদেরও তা বহু সময়ে প্রভাবিত করেছে। আবার মনোরঞ্জক উপন্যাসের লেখকেরাও বিশেষ করে মধ্যবিত্ত জীবনের সামাজিক সংকটকে উপন্যাসে রূপ দেবার কাজে এগিয়ে আসেন।

এ জাতীয় উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ হল সাধারণত মধ্যবিত্ত সমাজকে অবলম্বন করেই এগুলি লেখা হয় এবং মধ্যবিত্ত বাঙালির সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাই উপন্যাসে প্লট নির্মাণে প্রধান হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত প্রেম, প্রজন্ম-দ্বন্দ্ব, অল্পবয়স্ক তরুণ-তরুণীদের চিন্তাভাবনাকে তুলে ধরার দিকটা বড়ো হয়ে দেখা দেয় এই সব উপন্যাসে। ভাষা হয় সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিশীল। মোটের উপর বাঙালি মধ্যবিত্তের রুচিকে লালিত ও প্রতিফলিত করে এই জাতের উপন্যাস।

শতাব্দীর শেষ দুই দশকে বাংলা উপন্যাসের গঠন, চরিত্রচিত্রণ এবং প্রবণতার বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। ঘটনাবিরল, অন্তর্মুখী, আত্মভাবনামূলক এক ধরনের উপন্যাস কেউ কেউ লিখেছেন যেগুলি পাঠকমনোরঞ্জন না হলেও প্রকাশনা সংস্থার কিছু আনুকূল্য পেয়েছে। অন্যদিকে যৌন সম্পর্ক এবং সামাজিক ভায়োলেন্সকে উপন্যাসে বিস্তৃত করে দেখাবার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকখানি। বেশ কয়েকজন নারী লেখক নিজেদের দৃষ্টিকোণকে সাহসের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এই পর্বে।

কিন্তু আমরা যে ঔপন্যাসিকদের সৃষ্টিসম্ভার নিয়ে আলোচনা করলাম সেখানে এই শেষ দুই দশকের উপন্যাসের কথা প্রধান হয়ে ওঠেনি। একান্ত সাম্প্রতিকের বিশ্লেষণ করবার জন্য কিছুটা সময়-দূরত্ব এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণের প্রয়োজন হয় যা একান্ত সাম্প্রতিক কালের লেখা সম্পর্কে পাঠক ও সমালোচকের মনে ততটা গড়ে ওঠে না। আমাদের আলোচনায় প্রধানত গুরুত্ব পেয়েছে স্বাধীনতা-উত্তর পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশকের লেখকদের রচনা এঁদের মধ্যে কেউ কেউ লেখা শুরু করেছেন স্বাধীনতার দু-এক বছর আগেই। কিন্তু তাঁদের ঔপন্যাসিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল এবং বিশিষ্ট উপন্যাসগুলির রচনাকাল ছিল এই সময়ের মধ্যেই। একটি দেশ প্রায় দুশো বছর ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন থাকবার পর স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ফলে বিভিন্ন দিকে থেকে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে তার সমাজ, রাজনীতি এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। দ্রুত বদলে যাচ্ছে মানুষের মন। এই পরিবর্তনের কালচিহ্ন স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম তিন দশকের উপন্যাসে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে স্বাক্ষরিত ছিল।

নাটক :

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এবং তার পরে বাঙালির ওপর যে আর্থ-সামাজিক দুর্যোগ-বিপত্তির ঝড় প্রবাহিত হয়েছে তার তুলনা নেই। কবিতা, গল্প এবং উপন্যাসের মতো নাটকেও তার প্রতিফলন অবিরল। বিজন ভট্টাচার্য লিখেছেন 'নবান্ন'-এর মতো নাটক, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অন্তরাল', 'তরঙ্গ', 'বাস্তুভিটা', 'মোকাবিলা', তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার', 'উলুখাগড়া', 'পথিক'—সবই এই দ্বিতীয় যুদ্ধ সমকালীন এবং যুদ্ধোত্তর জীবনের বিবিধ বিপর্যয়ের দর্পণ। নাটক নেমে এসেছে একেবারে অতি সাধারণ মানুষের কাছে—তাদেরও আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনার অবিকল প্রতিধ্বনিসমেত। বিজন ভট্টাচার্য মন্বন্তরের মধ্যেও মানুষকে দেখিয়েচিলেন 'নবান্ন' উৎসবের স্বপ্ন, সেই প্রতিরোধের কথা কখনো তির্যক, কখনো বা সরাসরি এসেছে দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তুলসী লাহিড়ীর নাটকেও। এও এক নাট্য আন্দোলন—জনসাধারণকে নিয়ে, তাদের জন্য। স্বাধীন ভারত এবং সমাজতান্ত্রিক নতুন পৃথিবীর স্বপ্নই এই সব কিছুর প্রেরণা-প্রবর্তন।

আমরা এই আলোচনাটি এখানেই শেষ করার অনুমতি চাইছি। কারণ অনেক ভালো লেখা কবিতা ছোটগল্প উপন্যাস হয়তো এখানে আলোচিত হল না। তাতে মূল প্রসঙ্গ এবং তার সাহিত্যরূপের বৈশিষ্ট্য চিনতে অসুবিধার কথা নয়। অজস্র উদাহরণের চেয়ে বাঙালির যাত্রাপথ যে নতুন গতিতে সঞ্চারিত হল, তা নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারব।

একক ১৬ ❑ উদ্বাস্তু বাঙালি, নকশাল আন্দোলন, বিশ্বায়নের অভিঘাত

গঠন

১৬.১ উদ্দেশ্য
১৬.২ প্রস্তাবনা
১৬.৩ উদ্বাস্তু বাঙালি
১৬.৪ নকশাল আন্দোলন
১৬.৫ বিশ্বায়ন
১৬.৬ সারাংশ
১৬.৭ অনুশীলনী
১৬.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১৬.১ উদ্দেশ্য

বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে বিশ শতকে একাধিক অভিঘাত লক্ষ্যণীয়। বাঙালির মর্মমূলে যেসব ঘটনা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার মধ্যে দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তর ও দেশভাগের প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই এককটিকে তার পরবর্তী অংশ ধরে নিলে, আপনারা এই একক থেকে দেশভাগজনিত উদ্বাস্তু সমস্যা, ৭০-এর নক্‌শাল আন্দোলন ও গত শতকের বিশ্বায়ন সম্পর্কিত পাঠ গ্রহণ করতে সমান হবেন।

১৬.২ প্রস্তাবনা

বিশ শতকের বাঙালি জীবনের পরিচয় তুলে ধরা এই এককের অন্যতম লক্ষ্য। সেই সূত্রে পূর্ববর্তী এককের সঙ্গে সংগতি বজায় রেখে এই এককে উদ্বাস্তু বাঙালি জীবনের মূল সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে। বাংলার সাহিত্যে তার কতখালি প্রতিফলন ঘটেছে তা তুলে ধরা হয়েছে। নকশাল আন্দোলনের আলোচনা সূত্রে উত্তাল সময়টিকে তুলে ধরা হয়েছে। সর্বোপরি, নব্বই-এর দশকের বিশ্বায়ন প্রসঙ্গ সূত্রে তার সুফল ও কুফলগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৬.৩ উদ্বাস্তু বাঙালি

ভারত ভাগ হল, বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশ দ্বিখণ্ডিত হল। যারা (অ-মুসলিম) পূর্ববঙ্গ বা পশ্চিম পাঞ্জাবে ছিল তারা নিজেদের দেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হল। পাঞ্জাবে নাগরিক বিনিময়

স্বাভাবিকভাবে হলেও বঙ্গদেশে সহজে হয়নি। সেখানে সমস্ত অমুসলিম নাগরিকগণ একসঙ্গে আসতে পারেনি। ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্টের পর পূর্ববঙ্গ থেকে নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে বহু হিন্দু বাঙালিকে চলে আসতে হয়। যারা আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতের অন্যত্র কর্মসূত্রে থাকতেন বা যাঁদের আত্মীয় স্বজন পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতে ছিল তাঁরা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলেন। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ এদেশে চলে এসে রেলস্টেশন, আশ্রয় শিবিরে পশুর মত কাটাতে লাগল। তারপর তাদের বিভিন্ন জায়গায়, দণ্ডকারণ্য, আন্দামান প্রভৃতি স্থানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হল।

রাজনৈতিক বিবাদে মানুষকে উদ্বাস্তু হতে হল। [উদ্ + বাস্তু = উদ্বাস্তু অর্থাৎ বাস্তু বা ভিটে থেকে উৎখাত হওয়া মানুষ]। আবার ১৯৭১ সালের পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধে সেই পূর্ববঙ্গের মানুষকে উদ্বাস্তু হতে হল।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট বাঙালির জীবনে এক ট্রাজিক দিন। দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতার হাত ধরে বাঙালির এক অংশকে উদ্বাস্তু হতে হল। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পূর্ববঙ্গ থেকে কিছু মানুষ ভারতবর্ষে চলে আসে। লড়াই করে অস্তিত্ব রক্ষা করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে। একটা সীমান্তরেখা তাদের জীবনকে তছনছ করে দেয়। তারা হয়ে যায় পরবাসী। নিজের দেশ থেকে উৎখাত হয়ে একটা নিরাপদ মাথা গোঁজার ঠাঁই খোঁজে তারা। দেশভাগের পর ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসা এই সবহারানো মানুষদের জমি জমা সবই ছিল। সব ছেড়ে চলে আসা এই মানুষরাই ভারতবর্ষে 'উদ্বাস্তু' বা 'শরণার্থী' নামে পরিচিত হয়। স্থান পায় এদেশের আশ্রয় শিবিরে। ধুবুলিয়া ক্যাম্প, কুপার্স ক্যাম্প, পি. এল. ক্যাম্প—এরকম নামে পরিচিত আশ্রয় শিবিরগুলোতে। এদের কথা লিখেছেন হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 'উদ্বাস্তু' গ্রন্থে এবং প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী 'প্রান্তিক মানব পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু জীবনের কথা' গ্রন্থে। দেশভাগ নিয়ে অনেক লেখালেখি হলেও উদ্বাস্তুদের নিয়ে খুব বেশি লেখা আজও চোখে পড়ে না।

উদ্বাস্তুদের জীবন, তাদের নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েন, তাদের জীবনের অন্তঃপ্রবাহ সেভাবে সাহিত্যে রেখাপাত করে নি। উদ্বাস্তু সমস্যা ভারতবর্ষের মধ্যে পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গে বেশি প্রভাব ফেলেছিল। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪৬ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত অনেকবার হিন্দু বাঙালিরা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে। ফলে উদ্বাস্তু নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা হয়ে উঠেছে প্রকট।

উদ্বাস্তুদের নিয়ে কয়েকটা উপন্যাসও লেখা হয়েছে। যেমন, দেবেশ রায়ের 'বরিশালের যোগেন মণ্ডল', নারায়ণ সান্যালের 'বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প', শক্তিপদ রাজগুরুর 'দন্ডক থেকে মরিচঝাঁপি', শচীন দাসের 'উদ্বাস্তু নগরীর চাঁদ', প্রফুল্ল রায়ের 'নোনাজল মিঠে মাটি' ইত্যাদি। এখানে যেমন আছে উদ্বাস্তু সমস্যার কথা, তেমনি আছে যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনযাত্রার বিবরণ। নিজেদের ব্যক্তিগত জাত পরিচয় ভুলে এই মানুষগুলো 'উদ্বাস্তু' পরিচয়ে বাঁচতে থাকে। পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যের অভাব, চিকিৎসার অভাব এদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। ফলে এদের সঙ্গে অন্ধকার জগতের সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা বাড়তে থাকে এই সময় থেকে। সব মিলিয়ে উদ্বাস্তু জীবনে ঘনিয়ে ওঠা বিপর্যয় এবং তাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই এই পর্বের এক অন্যতম বিষয়বস্তুরূপে পরিগণিত হয়ে ওঠে।

১৬.৪ নকশাল আন্দোলন

যখন দেশভাগের যন্ত্রণা, বাস্তুহারায় দুর্দশা ও তাদের পুনর্বাসনের সমস্যায় পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত সরকার নাজেহাল, নানা পরিকল্পনার ব্যবস্থা করছে তখনই তখনই ষাটের দশকে উত্তরবঙ্গে নকশালবাড়ি অঞ্চলে শুরু হল এক আন্দোলন, যা নকশাল আন্দোলন নামে পরিচিত যাতে সারা বাংলা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। বহু তরুণ নকশাল আন্দোলনে যোগ দিল। বহু হতাহত হল। তারপর ৭০-এর দশকে তা দমিত হল।

উত্তরবঙ্গের এই কৃষক আন্দোলন মূলত নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া আর খড়িবাড়ি এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথমদিকে জোরালো পুলিশ আক্রমণের কারণে এই আন্দোলন স্তিমিত হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে এই আন্দোলন ও তার মতবাদের ধারা পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। নকশালবাড়ির আন্দোলন হলেও 'নকশাল' শব্দে এক বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ জনমানসে প্রভাব বিস্তার করে। কারও কারও মতে ভারতবর্ষের মতো কৃষি নির্ভর দেশে বিপ্লবী বদল আনার ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল। এই আন্দোলনকে সমর্থন জানায় চিন। প্রচার হতে থাকে 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান'। ততদিন বামপন্থী রাজনীতিতে মার্কস্, এঙ্গেলস্, লেনিন এবং স্তালিন—এই চারজনের নাম আলোচিত হত। নকশাল আন্দোলন নিয়ে এল মাওকে। ছড়িয়ে পড়ল মাওবাদ। সংসদীয় রাজনীতিতে নকশালরা বিশ্বাসী ছিল না। তাদের রাজনীতি ছিল সশস্ত্র। এর ফলে ছড়িয়ে পড়ে হিংসার রাজনীতি। নকশালরা জোতদার, পুলিশকর্মী হত্যা, বিরোধী রাজনৈতিক দলনেতা হত্যা করে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তৈরি করে। স্কুল কলেজ আক্রমণ, শিক্ষা ব্যবস্থা বয়কটের ডাক দেয়। চারু মজুমদার, কানু সান্যাল এদের নেতৃত্বে তৈরি হয় নতুন রাজনৈতিক দল সি. পি. আই (এম. এল.)।

একই সঙ্গে ভূমি সংস্কার আন্দোলনও শুরু হল। তার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ভূমি—আইন চালু হল।

১৬.৫ বিশ্বায়ন

ইংরেজি 'গ্লোবালাইজেশন' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বিশ্বায়ন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে নিবিড় করার পথই হচ্ছে বিশ্বায়ন। বিশ্বকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কারিগরি নানান ক্ষেত্রে এর প্রভাব। পাশ্চাত্যদেশের প্রথম সারির রাজনীতিবিদরা এই প্রক্রিয়া চালু করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে গ্যাট, ডব্লুটিও, নাফটা, সাফটা, আসিয়ান—এ জাতীয় চুক্তির ফলে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকি ও সামাজিক—এই তিনটি দিকেই এর ক্ষেত্র প্রসারিত। তথ্য-প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতির ফলে এ বিষয়টা জনমানসে সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। শিল্প সংক্রান্ত বিশ্বায়ন, বিশ্বব্যাপী আর্থিক বাজারের প্রসার, ভাষা সংক্রান্ত বিশ্বায়ন, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিযোগিতামূলক বাজার তৈরি, বিশ্বের পরিবেশ রক্ষা ইত্যাদি বিষয় জনজীবনে সহায়ক শক্তি রূপে কাজ করছে। বিশ্বায়ন বিশ্বব্যাপী সমষ্টিগত নানা পরিচালনার দিক দেখালেও এর সুবিধা এবং অসুবিধা দুইই আছে।

সুবিধা হল—দরিদ্র দেশগুলোর উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করা, অবাধ আমদানি-রপ্তানি, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বৈদেশিক বিনিয়োগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহজলভ্যতা, শিল্প-শিক্ষা-সংস্কৃতির বিনিময়—এক কথায় মুক্তবাজার অর্থনীতির জোয়ার আনা।

অসুবিধা হল—দেশীয় উৎপাদনের ক্ষতি হওয়া, সবদিক থেকে উন্নত দেশগুলো সমৃদ্ধ হওয়া, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে পরনির্ভরশীল করে তোলা, মূল্যবোধের বিপর্যয় ঘটা, জাতীয়তার বিনাশ একটা সর্বনাশের দিক তৈরি করে।

বিশ্বায়ন বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলে। তবে বিশ্বায়নের অন্যতম ফল হল শিল্পের বেসরকারিকরণ, শ্রমিকের চাহিদা হ্রাস পায়। এখানে প্রযুক্তির উন্নতি হলেও ক্ষমতা কেন্দ্রীভবন হয়ে পড়ে। বর্তমানে বিশ্বের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রযুক্তিবিদ্যা তথা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন মানুষের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে সারা বিশ্ব পরস্পরের অতি নিকটে চলে আসে। বঙ্গদেশে প্রথমে কম্পিউটার ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। পরে নব্বই-এর দশকে আর দূরে থাকা গেল না। সারা বিশ্বের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গও তাতে সামিল হল।

১৬.৬ সারাংশ

এই এককে বিষয়বস্তু আলোচনা একসঙ্গে করলাম। মন্বন্তর দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল।

১৬.৭ অনুশীলনী

বিস্তৃত বিশ্লেষণাত্মক উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বিভাজনের পার্থক্য আলোচনা করুন।

২। দুই জাতি তত্ত্ব বলতে কি বোঝেন?

৩। ভারতবর্ষের ভাগাভাগি ট্র্যাজিক কেন?

৪। জাতীয়তাবাদ ও অস্তিত্বের সংকট আলোচনা করুন?

৫। ১৯৪৭ নাগাদ সহযোগিতা ও মৈত্রী হারিয়ে গেছিল কেন?

৬। জাতীয় আন্দোলনে কাদের আধিপত্য ছিল?

৭। ১৯৩৬ কৃষক প্রজা আন্দোলন চরমে পৌঁছল কেন?

৮। জাতীয়তাবাদ ও অস্তিত্ব ১৯৪৭-এর প্রেক্ষিতে আলোচনা করুন।

৯। দেশ বিভাগ ও সাহিত্যিক আখ্যান কীভাবে সংযুক্ত?

১০। দেশ ভাগের পর উদ্বাস্তু বাঙালির অবস্থা সংক্ষেপে লিখুন?

১১। উনিশ শতকের বাংলার সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

১২। 'সংস্কৃতি' শব্দটির ব্যাখ্যা করুন।

১৩। 'সভ্যতা তরুর পুষ্প যেন সংস্কৃতি'—ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। 'তমদ্দুন' শব্দটির উৎস কী? একে Culture-এর প্রতিশব্দ হিসাবে গ্রহণ না করার কারণ কী?

২। কার উদ্যোগে মঞ্চ তৈরি করে বাংলায় অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। কবে এবং কোন নাটক?

৩। 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদকের নাম লিখুন।

৪। 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' বলতে কী বোঝেন? এই মন্বন্তরের কারণ লিখুন।

৫। বাংলার 'চলচ্চিত্র' শিল্প বিষয়ে একটি টীকা লিখুন।

৬। সংক্ষেপে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সেনের কাব্য চর্চার পরিচয় দিন।

৭। বৈষ্ণব প্রভাব বা চৈতন্য প্রভাব বাংলার জীবনে কতখানি, তা সংক্ষেপে লিখুন।

১৬.৮ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। 'ভারতকোষ' (১-৫ খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা।

২। 'একালের প্রবন্ধ সঞ্চয়ন', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩। স্মৃতি সত্তায় দেশভাগ — সেমন্তী ঘোষ

৪। পার্টিশন সাহিত্য : দেশ কাল স্মৃতি : সম্পা. : মননকুমার মণ্ডল